চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠিপত্র

চিরঞ্জীবেষু

ভায়া নবীনকিশোর, এখনকার আদবকায়দা আমার ভালো জানা নাই—সেই জন্য তোমাদের সঙ্গে প্রথম আলাপ, বা চিঠিপত্র আরম্ভ করিতে কেমন ভয় করে। আমরা প্রথম আলাপে বাপের নাম জিজ্ঞাসা করিতাম কিন্তু শুনিয়াছি এখনকার কালে বাপের নাম জিজ্ঞাসা দস্তুর নয়। সৌভাগ্যক্রমে তোমার বাবার নাম আমার অবিদিত নাই, কারণ আমিই তাঁহার নামকরণ করিয়াছিলাম। ভালো নাম দিতে পারি নাই—গোবর্ধন নামটা কেন দিয়াছিলাম তাহা আজ বুঝিতেছি। তোমাকে বর্ধন করিবার ভার তাঁহার উপরে পড়িবে ভাগ্য-দেবতা তাহা জানিতেন। সেই জন্যই বোধ করি সেদিন ন্যায়রত্ন মহাশয় তোমাকে তোমার ঠাকুরের নাম জিজ্ঞাসা করাতে তোমার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। তা তুমিই না হয় তোমার বাবার নূতন নামকরণ করো। আমার গোবর্ধন নাম আমি ফিরাইয়া লইতেছি।

আসল কথা কী জান। সেকালে আমরা নাম লইয়া এত ভাবিতাম না। সেটা হয়তো আমাদের অসভ্যতার পরিচয়। আমরা মনে করিতাম নামে মানুষকে বড়ো করে না, মানুষই নামকে জাঁকাইয়া তোলে। মন্দ কাজ করিলেই মানুষের বদনাম হয়, ভালো কাজ করিলেই মানুষের সুনাম হয়। বাবা কেবল একটা নামই দিতে পারে কিন্তু ভালো নাম কিংবা মন্দ নাম সে ছেলে নিজেই দেয়। ভাবিয়া দেখো আমাদের প্রাচীন কালের বড়ো বড়ো নাম শুনিতে নিতান্ত মধুর নয়—যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্র ভীষ্ম, দ্রোণ, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, জন্মেজয়, বৈশম্পায়ন ইত্যাদি। কিন্তু ঐ সকল নাম অক্ষয়-বটের মতো আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের হৃদয়ে সহস্র শিকড়ে বিরাজ করিতেছে। আমাদের আজকালকার উপন্যাসের ললিত, নলিনমোহন প্রভৃতি কত মিঠি মিঠি নাম বাহির হইতেছে কিন্তু এখনকার পাঠক-পিপীলিকারা এই মিষ্ট নামগুলিকে দুই দণ্ডেই নিঃশেষ করিয়া ফেলে, সকালের নাম বিকালে টিকে না। যাহাই হউক, আমরা নামের প্রতি মনোযোগ করিতাম না। তুমি বলিতেছ, সেটা আমাদের ভ্রম। সেজন্য বেশি ভাবিয়ো না ভাই; আমরা শীঘ্রই মরিব এমন সম্ভাবনা আছে; আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসমাজের সমস্ত ভ্রম সমূলে সংশোধিত হইয়া যাইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি এখনকার আদবকায়দা আমার বড়ো জানা নাই, কিন্তু ইহাই দেখিতেছি আদবকায়দা এখনকার দিনে নাই, আমাদের কালেই ছিল। এখন বাপকে প্রণাম করিতে লজ্জাবোধ হয়, বন্ধুবান্ধবকে কোলাকুলি করিতে সংকোচ বোধ হয়, গুরুজনের সম্মুখে তাকিয়া ঠেসান দিয়া তাস পিটিতে লজ্জাবোধ হয় না, রেলগাড়িতে যে বেঞ্চে পাঁচ জনে বসিয়া আছে তাহার উপরে দুইখানা পা তুলিয়া দিতে সংকোচ জন্মে না। তবে হয়তো আজকাল অত্যন্ত সহৃদয়তার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, আদবকায়দার তেমন আবশ্যক নাই। সহৃদয়তা! তাই বুঝি কেহ পাড়াপ্রতিবেশীর খোঁজ রাখে না। বিপদ আপদে লোকের সাহায্য করে না; হাতে টাকা থাকিলে সামান্য জাঁক-জমক লইয়াই থাকে, দশ জন অনাথকে প্রতিপালন করে না; তাই বুঝি পিতামাতা অযত্নে অনাদরে কষ্টে থাকেন অথচ নিজের ঘরে সুখস্বচ্ছন্দতার অভাব নাই—নিজের সামান্য অভাবটুকু হইলেই রক্ষা নাই—কিন্তু পরিবারস্থ আর সকলের ঘরে গুরুতর অনটন হইলেও বলেন হাতে টাকা নাই। এই তো ভাই এখনকার সহৃদয়তা। মনের দুঃখে অনেক কথা বলিলাম। আমি কালেজে পড়ি নাই সুতরাং আমার এত কথা বলিবার কোনো অধিকার নাই। কিন্তু তোমরা কিছু আমাদের নিন্দা করিতে ছাড় না, আমরাও যখন তোমাদের সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলি সে কথাগুলোয় একটু কর্ণপাত করিয়ো।

চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিয়াই তোমাকে কী "পাঠ" লিখিব এই ভাবনা প্রথমে মনে উদয় হয়। এক বার ভাবিলাম লিখি "মাই ডিয়ার নাতি", কিন্তু সেটা আমার সহ্য হইল না; তার পরে ভাবিলাম বাংলা করিয়া লিখি "আমার প্রিয় নাতি", সেটাও বুড়োমানুষের এই খাকড়ার কলম দিয়া বাহির হইল না। খপ করিয়া লিখিয়া ফেলিলাম "পরমশুভাশীর্বাদরাশয়ঃ সন্তু।" লিখিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ভাবিলাম ছেলেপিলেরা তো আমাদিগকে প্রণাম করা বন্ধ করিয়াছে তাই বলিয়া কি আমরা আহাদিগকে আশীর্বাদ করিতে ভুলিব। তোমাদের ভালো হউক ভাই, আমরা এই চাই; আমাদের যা হইবার হইয়া গিয়াছে। তোমরা আমাদের প্রণাম কর আর না কর আমাদের তাহাতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কিন্তু তোমাদের আছে। ভক্তি করিতে যাহাদের লজ্জাবোধ হয় তাহাদের কোন কালে মঙ্গল হয় না। বড়োর কাছে নিচু হইয়া আমরা বড়ো হইতে শিখি, মাথাটা তুলিয়া থাকিলেই যে বড়ো হই তাহা নয়। পৃথিবীতে আমার চেয়ে উঁচু আর কিছুই নাই, আমি বাবার জ্যেষ্ঠতাত, আমি দাদার দাদা, এই যে মনে করে সে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তাহার হৃদয় এত ক্ষুদ্র যে সে আপনার চেয়ে বড়ো কিছুই কল্পনা করিতে পারে না। তুমি হয়তো আমাকে বলিবে, তুমি

আমার দাদামহাশয় বলিয়াই যে তুমি আমার চেয়ে বড়ো এমন কোনো কথা নাই। আমি তোমার চেয়ে বড়ো নই! তোমার পিতা আমার স্নেহে প্রতিপালিত হইয়াছেন, আমি তোমার চেয়ে বড়ো নই তো কী। আমি তোমাকে স্নেহ করিতে পারি বলিয়া আমি তোমার চেয়ে বড়ো, হৃদয়ের সহিত তোমার কল্যাণ কামনা করিতে পারি বলিয়াই আমি তোমার চেয়ে বড়ো। তুমি না হয় দু-পাঁচখানা ইংরেজি বই আমার চেয়ে বেশি পড়িয়াছ, তাহাতে বেশি আসে যায় না। আঠার হাজার ওয়েব্‌স্টার ডিক্‌শনারির উপর যদি তুমি চড়িয়া বস তাহা হইলেও তোমাকে আমার হৃদয়ের নিচে দাঁড়াইতে হইবে। তবুও আমার হৃদয় হইতে আশীর্বাদ নামিয়া তোমার মাথায় বর্ষিত হইতে থাকিবে। পুঁথির পর্বতের উপর চড়িয়া তুমি আমাকে নিচু নজরে দেখিতে পার, তোমার চক্ষের অসম্পূর্ণতাবশত আমাকে ক্ষুদ্র দেখিতে পার, কিন্তু আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে পার না। যে ব্যক্তি মাথা পাতিয়া অসংকোচে স্নেহের আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে পারে সে ধন্য, তাহার হৃদয় উর্বর হইয়া ফলে ফুলে শোভিত হইয়া উঠুক। আর যে ব্যক্তি বালুকাস্তূপের মতো মাথা উঁচু করিয়া স্নেহের আশীর্বাদ উপেক্ষা করে সে তাহার শূন্যতা শুষ্কতা শ্রীহীনতা তাহার মরুময় উন্নত মস্তক লইয়া মধ্যাহ্নতেজে দগ্ধ হইতে থাকুক। যাহাই হউক ভাই, আমি তোমাকে এক-শ বার লিখিব, "পরম শুভাশীর্বাদরাশয়ঃ সন্তু" তুমি আমার চিঠি পড় আর নাই পড়।

তুমিও যখন আমার চিঠির উত্তর দিবে প্রণামপূর্বক চিঠি আরম্ভ করিয়ো। তুমি হয়তো বলিয়া উঠিবে, "আমার যদি ভক্তি না হয় তো আমি কেন প্রণাম করিব। এ-সব অসভ্য আদবকায়দার আমি কোনো ধার ধারি না।" তাই যদি সত্য হয় তবে কেন ভাই তুমি বিশ্বসুদ্ধ লোককে "মাই ডিয়ার" লেখ। আমি বুড়ো, তোমার ঠাকুরদাদা, আজ সাড়ে তিন মাস ধরিয়া কাসিয়া মরিতেছি তুমি এক বার খোঁজ লইতে আস না। আর জগতের সমস্ত লোক তোমার এমনি প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাদিগকে "মাই ডিয়ার" না লিখিয়া থাকিতে পার না। এও কি একটা দস্তর মাত্র নয়। কোনোটা বা ইংরেজি দস্তর কোনোটা বাংলা দস্তর। কিন্তু সেই যদি দস্তুরমতোই চলিতে হইল তবে বাঙালির পক্ষে বাংলা দস্তরই ভালো। তুমি বলিতে পার, "বাংলাই কি ইংরেজিই কি, কোনো দস্তর কোনো আদবকায়দা মানিতে চাহি না। আমি হৃদয়ের অনুসরণ করিয়া চলিব।" তাই যদি তোমার মত হয় তুমি সুন্দরবনে গিয়া বাস করো, মনুষ্যসমাজে থাকা তোমার কর্ম নয়। সকল মানুষেরই কতকগুলি কর্তব্য আছে, সেই কর্তব্যশৃঙ্খলে সমাজ জড়িত। আমার কর্তব্য আমি না করিলে তোমার কর্তব্য তুমি ভালোরূপে করিতে পার না। দাদামহাশয়ের

কতকগুলি কর্তব্য আছে, নাতির কতকগুলি কর্তব্য আছে। তুমি যদি আমার বশ্যতা স্বীকার করিয়া আমার আদেশ পালন কর, তবেই তোমার প্রতি আমার যাহা কর্তব্য তাহা আমি ভালোরূপে সম্পন্ন করিতে পারি। আর, তুমি যদি বল আমার মনে ভক্তির উদয় হইতেছে না, তখন আমি কেন দাদামহাশয়ের কথা শুনিব, তাহা হইলে যে কেবল তোমার কর্তব্য অসম্পূর্ণ রহিল তাহা নহে, তাহা হইলে আমার কর্তব্যেরও ব্যাঘাত হয়। তোমার দৃষ্টান্তে তোমার ছোটো ভাইরাও আমার কথা মানিবে না, দাদামহাশয়ের কাজ আমার দ্বারা একেবারেই সম্পন্ন হইতে পারিবে না। এই কর্তব্যপাশে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্তব্য অবিশ্রাম স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য সমাজে অনেকগুলি দস্তুর প্রচলিত আছে। সৈন্যদের যেমন অসংখ্য নিয়মে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হয় নহিলে তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে না, সকল মানুষকেই তেমনি সহস্র দস্তুরে বদ্ধ থাকিতে হয়, নতুবা তাহারা সমাজের কার্য পালনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে না। যে গুরুজনকে তুমি প্রণাম করিয়া থাক যাঁহাকে প্রত্যেক চিঠিপত্রে তুমি ভক্তির সম্ভাষণ কর, যাঁহাকে দেখিলে তুমি উঠিয়া দাঁড়াও, ইচ্ছা করিলেও সহসা তাঁহাকে তুমি অমান্য করিতে পার না। সহস্র দস্তুর পালন করিয়া এমনি তোমার মনে শিক্ষা হইয়া যায় যে, গুরুজনকে মান্য করা তোমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হইয়া উঠে, না করা তোমার পক্ষে সাধ্যাতীত হইয়া উঠে। আমাদের প্রাচীন দস্তুর সমস্ত ভাঙিয়া ফেলিয়া আমরা এই সকল শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইতেছি। ভক্তি-স্নেহের বন্ধন ছিঁড়িয়া যাইতেছে। পারিবারিক সম্বন্ধ উলটাপালটা হইয়া যাইতেছে। সমাজে বিশৃঙ্খলা জন্মিয়াছে। তুমি দাদামহাশয়কে প্রণাম করিয়া চিঠি লিখিতে আরম্ভ কর না। সেটা শুনিতে অতি সামান্য বোধ হইতে পারে কিন্তু নিতান্ত সামান্য নহে। কতকগুলি দস্তুর আমাদের হৃদয়ের সহিত জড়িত, তাহার কতটুকু দস্তুর বা কতটুকু হৃদয়ের কার্য বলা যায় না। অকৃত্রিম ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমরা প্রণাম করি কেন। প্রণাম করাও তো একটা দস্তুর। এমন দেশ আছে যেখানে ভক্তিভাবে প্রণাম না করিয়া আর কিছু করে। আমরা প্রণাম না করিয়া হাঁ করি না কেন। প্রণামের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে ভক্তির বাহ্যলক্ষণস্বরূপ একপ্রকার অঙ্গভঙ্গি আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে। যাঁহাকে আমরা ভক্তি করি তাঁহাকে স্বভাবতই আমাদের হৃদয়ের ভক্তি দেখাইতে ইচ্ছা হয়, প্রণাম করা সেই ভক্তি দেখাইবার উপায় মাত্র। আমি যদি প্রণাম না করিয়া ভক্তিভরে তিন বার হাততালি দিই তাহা হইলে যাঁহাকে ভক্তি করিলাম তিনি কিছুই বুঝিতে পারিবেন না, এমন কি তাহা অপমান জ্ঞান করিতে পারেন। ভক্তি দেখাইবার সময়ে হাততালি দেওয়াই যদি দস্তুর থাকিত

তাহা হইলে প্রণাম করা অত্যন্ত দোষের হইত সন্দেহ নাই। অতএব দস্তরকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে পারি না, হৃদয়ের অভাব প্রকাশ করি বটে।

অতএব আমাকে প্রণামপুরঃসর চিঠি লিখিবে ; ভক্তি থাক্ আর নাই থাক্, সে দেখিতে বড়ো ভালো হয়। তোমার দেখাদেখি আর পাঁচ জনে দাদামহাশয়কে ভদ্র রকমে চিঠি লিখিতে শিখিবে এবং ক্রমে ভক্তি করিতেও শিখিবে।

আশীর্বাদক

শ্রীষষ্ঠীচরণ দেবশর্মণঃ

২

শ্রীচরণকমলযুগলেষু

আরও ভক্তি চাই, যুগলের উপব আরও এক জোড়া বাড়াইয়া দিব। দাদামহাশয় তোমার অন্ত পাওয়া ভার, চিরকাল তুমি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টাতামাশা করিয়া আসিয়াছ, আর আজ হঠাৎ ভক্তি আদায় করিবার জন্য আমাদের উপর এক পরোয়ানাপত্র বাহির করিয়াছ, ইহার অর্থ কী। আমি দেখিয়াছি, যে অবধি তোমার সুমুখের এক জোড়া দাঁত পড়িয়া গিয়াছে সেই অবধি তোমার মুখে কিছুই বাধে না। তোমার দাঁত গিয়াছে বটে কিন্তু তীব্র ধারটুকু তোমার জিভের আগায় রহিয়া গিয়াছে। আর আগেকার মতো পরমানন্দে রুইমাছের মুড়ো চিবাইতে পার না, সুতরাং দংশন করিবার সুখ তোমার নিরীহ নাতিদের কাছ হইতে আদায় কর। তোমার দন্তহীন হাসিটুকু আমার বড়ো মিষ্ট লাগে। কিন্তু তোমার দন্তহীন দংশন আমার তেমন উপাদেয় বলিয়া বোধ হয় না।

তোমাদের কালের সবই ভালো, আমাদের কালের সবই মন্দ, এইটি তুমি প্রমাণ করিতে চাও। দু-একটা কথা বলিবার আছে ; তাহাতে যদি তোমাদের আদব-কায়দার কোনো ব্যতিক্রম হয় তবে আমাকে মাপ করিতে হইবে। আমরা যাহা করি তাহা তোমাদের চক্ষে বেয়াদবি বলিয়া ঠেকে, এই জন্যই ভয় হয়। তোমরা চোখে কম দেখ কিন্তু নাতিদের একটি সামান্য ত্রুটি চশমা না লইয়াও বেশ দেখিতে পাও।

যে-লোক যে-কালে জন্মগ্রহণ করে সে-কালের প্রতি তাহার যদি হৃদয়ের অনুরাগ না থাকে তবে সে-কালের উপযোগী কাজ সে ভালো করিয়া করিতে পারে না। যদি সে মনে করে, যে-কাল গেছে তাহাই ভালো, আর আমাদের কাল অতি হেয়, তবে

তাহার কাজ করিবার বল চলিয়া যায়, ভূত কালের দিকে শিয়র করিয়া সে কেবল স্বপ্ন দেখে ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এবং ভূতত্ব প্রাপ্ত হওয়াই সে একমাত্র বাঞ্ছনীয় মনে করে। স্বদেশ যেমন একটা আছে স্বকালও তেমনি একটা আছে। স্বদেশকে ভালো না বাসিলে যেমন স্বদেশের কাজ করা যায় না, তেমনি স্বকালকে ভালো না বাসিলে স্বকালের কাজও করা যায় না। যদি ক্রমাগতই স্বদেশের নিন্দা করিতে থাক, স্বদেশের কোনো গুণই দেখিতে না পাও, তবে স্বদেশের উপযোগী কাজ তোমার দ্বারা ভালোরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। কেবলমাত্র কর্তব্য বিবেচনা করিয়া তুমি স্বদেশের উপকার করিতে চেষ্টা করিতে পার, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় না। তোমার হৃদয়হীন কাজগুলো বিদেশী বীজের মতো স্বদেশের জমিতে ভালো করিয়া অঙ্কুরিত হইতে পারে না। তেমনি স্বকালের যে কেবল দোষই দেখে কোনো গুণ দেখিতে পায় না, সে চেষ্টা করিলেও স্বকালের কাজ ভালো করিয়া করিতে পারে না। এক হিসাবে সে নাই বলিলেও হয়; সে জন্মায় নাই, সে অতীত কালে জন্মিয়াছে, সে অতীত কালে বাস করিতেছে; এ কালের জনসংখ্যার মধ্যে তাহাকে ধরা যায় না। ঠাকুরদাদা মশায়, তুমি যে তোমাদের কালকে ভালো বাস এবং ভালো বল, সে তোমার একটা গুণের মধ্যে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে তোমাদের কালের কর্তব্য তুমি করিয়াছ। তুমি তোমার বাপ-মাকে ভক্তি করিয়াছ, তোমার পাড়াপ্রতিবেশীদের বিপদে আপদে সাহায্য করিয়াছ, শাস্ত্রমতে ধর্ম কর্ম করিয়াছ, দান ধ্যান করিয়াছ, হৃদয়ের পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছ। যে দিন আমরা আমাদের কর্তব্য কাজ করি, সে দিনের সূর্যালোক আমাদের কাছে উজ্জ্বলতর বলিয়া বোধ হয়, সে দিনের সুখস্মৃতি বহুকাল ধরিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। সে কালের কাজ তোমরা শেষ করিয়াছ, অসম্পূর্ণ রাখ নাই, সেই জন্য আজ এই বৃদ্ধ বয়সে অবসরের দিনে সে কালের স্মৃতি এমন মধুর বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া এ কালের প্রতি আমাদের বিরাগ জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছ কেন। ক্রমাগতই এ কালের নিন্দা করিয়া এ কালের কাছ হইতে আমাদের হৃদয় কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছ কেন। আমাদের জন্মভূমি এবং আমাদের জন্মকাল এই দুয়ের উপরেই আমাদের অনুরাগ অটল থাকে এই আশীর্বাদ করো।

গঙ্গোত্রীর সহিত গঙ্গার অবিচ্ছিন্ন সহস্রধারে যোগ রক্ষা হইতেছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া গঙ্গা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পিছু হটিয়া গঙ্গোত্রীর উপরে আর উঠিতে পারে না। তেমনি তোমাদের কাল ভালোই হউক আর মন্দই হউক আমরা কোনোমতেই ঠিক সে জায়গায় যাইতে পারিব না। এটা যদি নিশ্চয় হয় তবে সাধ্যাতীতের জন্য

নিষ্ফল বিলাপ ও পরিতাপ না করিয়া যে অবস্থায় জন্মিয়াছি তাহারই সহিত বনিবনাও করিয়া লওয়াই ভালো—ইহার ব্যাঘাত যে করে সে অনেক অমঙ্গল সৃষ্টি করে।

বর্তমানের প্রতি অরুচি ইহা প্রায়ই বর্তমানের দোষে হয় না, আমাদের নিজের অসম্পূর্ণতাবশত হয়, আমাদের হৃদয়ের গঠনের দোষে হয়। বর্তমানই আমাদের বাসস্থান এবং কার্যক্ষেত্র। কার্যক্ষেত্রের প্রতি যাহার অনুরাগ নাই সে ফাঁকি দিতে চায়। যথার্থ কৃষক আপনার চাষের জমিটুকুকে প্রাণের মতো ভালোবাসে, সেই জমিতে সে শস্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম বপন করে; আর যে কৃষক কাজ করিতে চায় না ফাঁকি দিতে চায়, নিজের জমিতে পা দিলে তাহার পায় যেন কাঁটা ফুটিতে থাকে, সে কেবলি খুঁত খুঁত করিয়া বলে আমার জমির এ দোষ সে দোষ, আমার জমিতে কাঁকর, আমার জমিতে কাঁটাগাছ ইত্যাদি। নিজের ছাড়া আর সকলের জমি দেখিলেই তাহার চোখ জুড়াইয়া যায়।

সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে এবং হইয়াই থাকে। সেই পরিবর্তনের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। নহিলে আমাদের জীবনই নিষ্ফল। নহিলে, মিউজিয়মে প্রাচীনকালের জীবেরা যেমন করিয়া স্থিতি করিতেছে আমাদিগকেও ঠিক তেমনি করিয়া পৃথিবীতে অবস্থান করিতে হইবে। পরিবর্তনের মধ্যে যেটুকু সার্থকতা আছে, যেটুকু গুণ আছে তাহা আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। কারণ সেইখান হইতে রসাকর্ষণ করিয়া আমাদিগকে বাড়িতে হইবে, আর কোনো গতি নাই। যদি আমরা সত্যই জলে পড়িয়া থাকি তবে সেখানে ডাঙার মতো চলিতে চেষ্টা করা বৃথা, সাঁতার দিতে হইবে।

অতএব, তুমি যে বলিতেছ, আমরা আজকাল গুরুজনকে যথেষ্ট মান্য করি না সেটা মানিয়া লওয়া যাক, তার পরে এই পরিবর্তনের ভিতরকার কথাটা এক বার দেখিতে চেষ্টা করা যাক। এ কথাটা ঠিক নহে যে, ভক্তিটা সময়ের প্রভাবে মানুষের হৃদয় হইতে একেবারে চলিয়া গেছে—তবে কি না, ভক্তিস্রোতের মুখ এক দিক হইতে অন্য দিকে গেছে এ কথা সম্ভব হইতে পারে বটে। পূর্বে আমাদের দেশে ব্যক্তিগত ভাবের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশি ছিল। ভক্তি বল ভালোবাসা বল একটা ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারিত না। এক জন মূর্তিমান রাজা না থাকিলে আমাদের রাজভক্তি থাকিতে পারিত না—কিন্তু শুদ্ধমাত্র রাজ্যতন্ত্রের প্রতি ভক্তি সে য়ুরোপীয় জাতিদের মধ্যেই দেখা যায়। তখন সত্য ও জ্ঞান গুরু নামক এক জন মনুষ্যের আকার ধারণ করিয়া থাকিত। তখন আমরা রাজার জন্য মরিতাম, ব্যক্তিবিশেষের

জন্য প্রাণ দিতাম—কিন্তু য়ুরোপীয়েরা কেবলমাত্র একটা ভাবের জন্য একটা জ্ঞানের জন্য মরিতে পারে। তাহারা আফ্রিকার মরুভূমিতে, মেরুপ্রদেশের তুষারগর্ভে প্রাণ বিসর্জন করিয়া আসিতেছে। কাহার জন্য। কোনো মানুষের জন্য নহে। বৃহৎ ভাবের জন্য, জ্ঞানের জন্য, বিজ্ঞানের জন্য। অতএব দেখা যাইতেছে য়ুরোপ মানুষের ভক্তি অনুরাগ জ্ঞানে ও ভাবে বিস্তৃত হইতেছে সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের ভাগে কিছু কিছু কম পড়িতেছে। সেই য়ুরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে ব্যক্তিবিশেষের চারি দিক হইতে আমাদের শিকড়ের পাক প্রতিদিন যেন অল্পে অল্পে খুলিয়া আসিতেছে। এখন মতের অনুরোধে অনেকে পিতামাতাকে ত্যাগ করিতেছেন, এখন প্রত্যক্ষ বাস্তুভিটাটুকু ছাড়িয়া অপ্রত্যক্ষ স্বদেশের প্রতি অনেকের প্রেম প্রসারিত হইতেছে, এবং সুদূর উদ্দেশ্যের জন্য অনেকে জীবনযাপন করিতে অগ্রসর হইতেছেন। এরূপ ভাব যে সম্পূর্ণ স্ফূর্তি পাইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ইহার কাজ চলিতেছে, ইহার নানা লক্ষণ অল্পে অল্পে প্রকাশ পাইতেছে। ইহার ভালোমন্দ দুইই আছে। সে কথা সকল অবস্থা সম্বন্ধেই খাটে। তবে, যখন এই পরিবর্তন একেবারে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তখন ইহার মধ্যে যে ভালোটুকু আছে সেটা যদি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি, সেই ভালোটুকুর উপর যদি অনুরাগ বদ্ধ করিতে পারি, তবে সেই ভালোটুকু শীঘ্র শীঘ্র স্ফূর্তি পাইয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে, মন্দটা ম্লান হইয়া যায়। নহিলে, সকল জিনিসের যেমন দস্তুর আছে, মন্দটাই আগেভাগে খুব কণ্টকিত হইয়া সকলের চোখে পড়ে, ভালোটা অনেক বিলম্বে গা-ঝাড়া দিয়া উঠে।

আমার কথা তো আমি বলিলাম এখন তোমার কথা তুমি বলো। তুমি কালেজে পড় নাই বলিয়া কিছুমাত্র সংকোচ করিয়ো না।* কারণ তোমারও লেখাতে কালেজের বিলক্ষণ গন্ধ ছাড়ে। সেটা সময়ের প্রভাব। ঘ্রাণে অর্ধভোজন হয় সেটা মিথ্যা কথা নয়। অতএব এখনকার সমাজে বসিয়া তুমি যে নিশ্বাস লইতেছ ও নস্য লইতেছ, তাহাতেই কালেজের অর্ধেক বিদ্যা তোমার নাকে সেঁধোইতেছে। নাক বন্ধ করিতে পারিতেছ না, কেবল নাক তুলিয়াই আছ যেন পেঁয়াজ-রসুনের ক্ষেতের মধ্যে বাস করিতেছ এবং তোমার নাতিরাই তাহার এক-একটি হৃষ্টপুষ্ট উৎপন্ন দ্রব্য। কিন্তু ইহা জানিয়ো এ গন্ধ ধুইলে যাইবে না মাজিলে যাইবে না, নাতিগুলোকে একেবারে সমূলে উৎপাটন করিতে পার তো যায়। কিন্তু এ তো আর তোমার পাকা চুল নয়, এ রক্তবীজের ঝাড়।

সেবক

শ্রীনবীনকিশোর শর্মণঃ

৩

চিরঞ্জীবেষু

ভায়া, দাদামহাশয়ের সঙ্গে ঠাট্টাতামাশা করিতে পাও বলিয়া যে তাঁহাদিগকে ভক্তি করিতে হইবে না, এটা কোনো কাজের কথা নহে। দাদামহাশয়রা তোমাদের চেয়ে এত বেশি বড়ো যে তাঁহাদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা করিলেও চলে। কেমনতরো জানো। যেমন ছোটো ছেলে বাপের গায়ে পা তুলিয়া দিলে তাহাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। কিন্তু তাহা হইতে এমন প্রমাণ হয় না যে, বাপের প্রতি সেই ছোটো ছেলের ভক্তি নাই, অর্থাৎ নির্ভরের ভাব নাই, অর্থাৎ সে সহজেই বাপকে আপনার চেয়ে বড়ো মনে করে না। তোমরা তেমনি আমাদের কাছে এত ছোটো যে আমরা নিরাপদে তোমাদের সহিত বেয়াদবি করিতে পারি, এবং অকাতরে তোমাদের বেয়াদবি সহিতে পারি। আর একটা কথা; সন্তানের শুভাশুভ সমস্তই পিতার উপর নির্ভর করিতেছে, এই জন্য স্বভাবতই পিতার স্নেহের সহিত শাসন আছে এবং পুত্রের ভক্তির সহিত ভয় আছে—পদে পদে কঠোর কর্তব্যপথে সন্তানকে নিয়োগ করিবার জন্য পিতার আদেশ করিতে হয় এবং পুত্রের তাহা পালন করিতে হয়, এই জন্য পিতাপুত্রের মধ্যে আচরণের শৈথিল্য শোভা পায় না। এইরূপে পিতার উপরে কঠোর স্নেহের ভার দিয়া দাদা-মহাশয় কেবলমাত্র মধুর স্নেহ বিতরণ করেন এবং নাতি নির্ভয় ভক্তিভরে দাদামহাশয়ের সহিত আনন্দে হাস্যালাপ করিতে থাকে কিন্তু সে হাস্যালাপের মর্মের মধ্যে যদি ভক্তি না থাকে তবে তাহা বেয়াদবির অধম। এত কথা তোমাকে বলা আবশ্যক ছিল না, কিন্তু তোমার লেখার ভঙ্গি দেখিয়া তোমাকে কিঞ্চিৎ সাবধান করিয়া দিতে হয়।

বাস রে! আজকাল তোমরা এত কথাও কহিতে শিখিয়াছ! এখন একটা কথা কহিলে পাঁচটা কথা শুনিতে হয়। তাহার মধ্যে যদি সব কথা বুঝিতে পারিতাম তাহা হইলেও এতটা গায়ে লাগিত না। ভাবের মিল থাকিলেও অনেক সময়ে আমরা পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারি না বলিয়া বিস্তর মনান্তর উপস্থিত হয়। আমি বুড়া-মানুষ, তোমার সমস্ত কথা ঠিক বুঝিয়াছি কি না কে জানে, কিন্তু যেরূপ বুঝিলাম সেই-রূপ উত্তর দিতেছি।

স্বকাল, পরকাল, এ এক নূতন কথা তুমি তুলিয়াছ। পরকালটা নূতন নয়—সম্মুখের একজোড়া দাঁত বিসর্জন দিয়া অবধি ঐ কালের কথাটাই ভাবিতেছি—কিন্তু স্বকাল আবার কী।

কালের কি কিছু স্থিরতা আছে না কি। আমরা কি ভাসিয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি যে কালস্রোতের উপর হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিব। মহৎ মনুষ্যত্বের

আদর্শ কি স্রোতের মধ্যবর্তী শৈলের মতো কালকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতেছে না।

আমরা পরিবর্তনের মধ্যে থাকি বলিয়াই একটা স্থির লক্ষ্যের প্রতি বেশি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। নহিলে কিছু ক্ষণ বাদে আর কিছুই ঠাহর হয় না—নহিলে আমরা পরিবর্তনের দাস হইয়া পড়ি, পরিবর্তনের খেলনা হইয়া পড়ি। তুমি যেরূপ লিখিয়াছ তাহাতে তুমি পরিবর্তনকেই প্রভু বলিয়াছ, কালকেই কর্তা বলিয়া মানিয়াছ—অর্থাৎ ঘোড়াকেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছ এবং আরোহীকেই তাহাব অধীন বলিয়া প্রচার করিতেছ। কালের প্রতি ভক্তি এইটেই তুমি সার কথা ধরিয়া লইয়াছ, কিন্তু মনুষ্যত্বের প্রতি ধ্রুব আদর্শের প্রতি ভক্তি তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

মনুষ্যের প্রতি প্রেম, পিতার প্রতি ভক্তি, পুত্রের প্রতি স্নেহ—এ যে কেবল পরিবর্তনশীল ক্ষুদ্র কালবিশেষের ধর্ম, এ কথা কে বলিতে সাহস করে। এ ধর্ম সকল কালের উপরেই মাথা তুলিয়া আছে। "উনবিংশ শতাব্দীর" ধূলি উড়াইয়া ইহাকে চোখের আড়াল করিতে পার, তাই বলিয়া ফুঁয়ের জোরে ইহাকে একেবারে ধূলিসাৎ করিতে পার না।

যদি সত্যই এমন দেখিয়া থাক যে এখনকার কালে পিতা-মাতাকে কেহ ভক্তি করে না, অতিথিকে কেহ যত্ন করে না, প্রতিবেশীদিগকে কেহ সাহায্য করে না—তবে এখনকার কালের জন্য শোক করো, কালের দোহাই দিয়া অধর্মকে ধর্ম বলিয়া প্রচার করিয়ো না।

অতীত ও ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া বর্তমানকে সংযত করিতে হয়। যদি ইচ্ছা কর তো চোখ বুজিয়া ছুটিবার সুখ অনুভব করিতে পার। কিন্তু অবিলম্বে ঘাড় ভাঙিবার সুখটাও টের পাইবে।

বর্তমানকাল ছুটিতেছে বলিয়াই শুদ্ধ অতীত কালের এত মূল্য। অতীত কালের প্রবল বেগ প্রচণ্ড গতি সংহত হইয়া যেন স্থির আকার ধারণ করিয়াছে। কালকে ঠাহর করিতে হইলে অতীতের দিকে চাহিতে হয়। অতীত বিলুপ্ত হইলে বর্তমান কালকে কেই বা চিনিতে পারে, কেই বা বিশ্বাস করে, তাহাকে সামলায় কাহার সাধ্য। কেননা, চিনিতে পারিলে জানিতে পারিলে তবে বশ করা যায়। যাহাকে জানি না সে আমাদের প্রভু হইয়া দাঁড়ায়। অতএব পরিবর্তনশীল কালকে ভয় করিয়া চলো, তাহাকে বশ করিতে চেষ্টা করো, তাহাকে নিতান্ত বিশ্বাস করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়ো না।

যাহা থাকে না, চলিয়া যায়, মুহুর্মুহু পরিবর্তিত হয়, তাহাকে আপনার বলিবে কী

করিয়া। একখণ্ড ভূমিকে আপনার বলা যায়, কিন্তু জলের স্রোতকে আপনার বলিবে কে। তবে আবার স্বকাল জিনিসটা কী।

তুমি লিখিয়াছ আমাদের সেকালে ব্যক্তির প্রতিই ভক্তি-প্রীতি প্রভৃতি বদ্ধ ছিল, ভাবের প্রতি ভক্তি-প্রীতি ছিল না। ব্যক্তির প্রতি ভক্তি-প্রীতি কিছু মন্দ নহে সে খুব ভালোই, সুতরাং আমাদের কালে যে সেটা খুব বলবান ছিল সে জন্য আমরা লজ্জিত নহি। কিন্তু তাই বলিয়া যদি বল যে, ভাবের প্রতি আমাদের কালের লোকের ভক্তি-প্রীতি ছিল না তবে সে কথাটা আমাকে অস্বীকার করিতে হয়। আমাদের কালে দুইই ছিল, এবং উভয়েই পরস্পর বনিবনাও করিয়া বাস করিত। একটা উদাহরণ দিই। আমাদের দেশে যে স্বামিপ্রীতি বা স্বামীভক্তি ছিল (এখনো হয়তো আছে) তাহা কী ; তাহা কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের প্রতি প্রীতি বা ভক্তি নয়, তাহা ব্যক্তি-বিশেষকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান, তাহা স্বামী নামক ভাবগত অস্তিত্বের প্রতি ভক্তি। ব্যক্তিবিশেষ উপলক্ষ্য মাত্র, স্বামীই প্রধান লক্ষ্য। এইজন্য ব্যক্তির ভালোমন্দের উপর ভক্তির তারতম্য হইত না। সকল স্ত্রীর সকল স্বামীই সমান পূজ্য। য়ুরোপীয় স্ত্রীর ভক্তি-প্রীতি ব্যক্তির মধ্যেই বদ্ধ, ভাবে গিয়া পৌঁছায় না। এই জন্য স্বামী নামক ব্যক্তিবিশেষের দোষগুণ অনুসারে তাহার ভক্তি-প্রীতি নিয়মিত হয়। এই জন্যই সেখানে বিধবাবিবাহে দোষ নাই, কারণ সেখানকার স্ত্রীরা ভাবকে বিবাহ করে না, ব্যক্তিকেই বিবাহ করে, সুতরাং ব্যক্তিত্বের অবসানেই স্বামিত্বের অবসান হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিগত সম্পর্কই এইরূপ সুগভীর ভাবের উপরে স্থায়ী।

কেবল ব্যক্তিগত সম্পর্ক কেন, অন্যান্য বিষয় দেখো না। আমাদের ব্রাহ্মণেরা কি সমাজের হিতার্থ সমাজ ত্যাগ করেন নাই। রাজারা কি ধর্মের জন্য বৃদ্ধ বয়সে রাজ্য ত্যাগ করেন নাই (য়ুরোপের রাজারা তাড়া না খাইলে কখনো এমন কাজ করেন ?)। ঋষিরা কি জ্ঞানের জন্য অমরতার জন্য সংসারের সমস্ত সুখ ত্যাগ করেন নাই। পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্র যৌবরাজ্য ত্যাগ, সত্যরক্ষার জন্য হরিশচন্দ্র স্বর্গত্যাগ, পরহিতের জন্য দধীচি দেহত্যাগ করেন নাই ? কর্তব্য অর্থাৎ ভাবমাত্রের জন্য আত্ম-ত্যাগ আমাদের দেশে ছিল না কে বলে। কুকুর যেরূপ অন্ধ আসক্তিতে মনিবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়, সীতা কি সেইভাবে রামের সঙ্গে সঙ্গে বনে গিয়াছিলেন, না মহৎ ভাবের পশ্চাতে মনুষ্য যেরূপ অকাতরে বিপদ ও মৃত্যুর মুখে ছুটিয়া যায় সীতা সেইরূপ ভাবে গিয়াছিলেন।

তবে কি ব্যক্তির প্রতি ও ভাবের প্রতি ভক্তি একই সময়ে থাকিতে পারে না। বর্তমানের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া "পারে না" বলিয়া এমন একটি রত্ন

অবহেলায় হারাইয়ো না। এই পর্যন্ত বলা যায় যে, কাহারও বা এক ভাবের প্রতি ভক্তি, কাহারও বা আর এক ভাবের প্রতি ভক্তি। কেহ বা লৌকিক স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে পারে, কেহ বা আত্মার স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে পারে।

এ সকল কথা তোমাদের বয়সে আমরা বুঝিতে পারিতাম না ইহা স্বীকার করিতে হয়—কিন্তু তোমরা অনেক কুটকচালে কথা বুঝিতে পার বলিয়াই এতখানি বকিলাম।

আশীর্বাদক
শ্রীষষ্ঠীচরণ দেবশর্ম্মণঃ

৪

শ্রীচরণেষু

দাদামশায়, তোমার চিঠি ক্রমেই হেঁয়ালি হইয়া উঠিতেছে। আমাদের চোখে এ চিঠি অত্যন্ত ঝাপসা ঠেকে। কোথায় রামচন্দ্র হরিশচন্দ্র দধীচি, অত দূরে আমাদের দৃষ্টি চলে না। তোমরাই তো বল আমাদের দূরদর্শিতা নাই—অতএব দূরের কথা দূর করিয়া নিকটের কথা তুলিলেই ভাল হয়।

আমরা যে মস্ত জাতি, আমাদের মতো এত বড়ো জাতি যে পৃথিবীর আর কোথাও মেলে না, তাহাতে আমাদের মনে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। বেদ বেদান্ত আগম নিগম পুরাণ হইতে ইহা অকাট্যরূপে প্রমাণ করিয়া দেওয়া যায়। আমাদের বেলুন ছিল, রেলগাড়ি ছিল, আমাদের স্টাইলোগ্রাফ পেন ছিল গণপতি তাহাতে মহাভারত লিখিয়াছিলেন, ডারুইনের বহুপূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাঁহাদের পূর্বতর পুরুষদিগকে বানর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, আধুনিক বিজ্ঞানের সমুদয় সিদ্ধান্তই শাণ্ডিল্য-ভৃগু-গৌতমের সম্পূর্ণ জানা ছিল, ইহা সমস্তই মানিলাম, কিন্তু তাই বলিয়াই যে আমরা আমাদের কৌলীন্য লইয়া স্ফীত হইতে থাকিব, সেই সুদূর কুটুম্বিতার মধ্যেই গুটি মারিয়া বসিয়া থাকিব, কাছাকাছির সহিত কোনো সম্পর্ক রাখিব না, এমন হইতে পারে না। বাল্যকালে এক দিন উত্তমরূপে পোলাও খাওয়া হইয়াছিল বলিয়া যে, অবশিষ্ট জীবন ভাতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। আমাদের বৈদিক পৌরাণিক যুগ যে চলিয়া গেছে, এ বড়ো দুঃখের বিষয়, এখন সকাল সকাল এই দুঃখ সারিয়া লইয়া বর্তমান যুগের কাজ করিবার জন্য একটু সময় করিয়া লওয়া আবশ্যক।

আমি যখন বলিয়াছিলাম ভাবের প্রতি আমাদের দেশের লোকের নিষ্ঠা নাই, ব্যক্তির প্রতিই আসক্তি, তখন আমি রামচন্দ্র-হরিশ্চন্দ্র-দধীচির কথা মনেও করি নাই—কীটের মতো যেখানকার যত পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে আমার উৎসাহ নাই। আমি অপেক্ষাকৃত আধুনিকের কথাই বলিতেছি। তর্কবিতর্কের প্রবৃত্তি দূর করিয়া এক বার ভাবিয়া দেখো দেখি, মহৎ ভাবকে উপন্যাসগত কুহেলিকা জ্ঞান না করিয়া মহৎ ভাবকে সত্য মনে করিয়া, তাহাকে বিশ্বাস করিয়া তাহার জন্য আমাদের দেশে কয় জন লোক আত্মসমর্পণ করে। কেবল দলাদলি, কেবল আমি আমি আমি এবং অমুক অমুক অমুক করিয়াই মরিতেছি। আমাকে এবং অমুককে অতিক্রম করিয়াও যে, দেশের কোনো কাজ কোনো মহৎ অনুষ্ঠান বিরাজ করিতে পারে ইহা আমরা মনে করিতে পারি না। এইজন্য আপন আপন অভিমান লইয়াই আমরা থাকি। আমাকে বড়ো চৌকি দেয় নাই অতএব এ সভায় আমি থাকিব না, আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে নাই অতএব ও কাজে আমি হাত দিতে পারি না, সে সমাজের সেক্রেটারি অমুক অতএব সে সমাজে আমার থাকা শোভা পায় না—আমরা কেবল এই ভাবিয়াই মরি। সুপারিশের খাতির এড়াইতে পারি না, চক্ষুলজ্জা অতিক্রম করিতে পারি না। আমার একটা কথা অগ্রাহ্য হইলে সে অপমান সহ্য করিতে পারি না। দুর্ভিক্ষনিবারণের উদ্দেশে কেহ যদি আমার সাহায্য লইতে আসে, আমি পাঁচ টাকা দিয়া মনে করি তাহাকেই ভিক্ষা দিলাম, তাহাকেই সবিশেষ বাধিত করিলাম, তাহার এবং তাহার ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ-সংখ্যক পূর্বপুরুষের নিকট হইতে মনে মনে কৃতজ্ঞতা দাবি করিয়া থাকি। নহিলে মনের তৃপ্তি হয় না—কোনো ব্যক্তিবিশেষকে বাধিত করিলাম না—আমি রহিলাম কলিকাতার এক কোণে, বীরভূমের এক কোণে এক ব্যক্তি আমার টাকায় মাসখানেক ধরিয়া দুই মুঠা ভাত খাইয়া লইল—ভারি তো আমার গরজ। পরোপকারী বলিয়া নাম বাহির হয় কার। যে ব্যক্তি আশ্রিতদের উপকার করে। অর্থাৎ, এক জন আসিয়া কহিল, "মহাশয় আপনার হাত ঝাড়িলে পর্বত, আপনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে আমার একটা গতি করিতে পারেন—আমি আপনাদেরই আশ্রিত।" মহামহিম মহিমার্ণব অমনি অবহেলে গুড়গুড়ি হইতে ধূমাকর্ষণপূর্বক অকাতরে বলিলেন, "আচ্ছা।" বলিয়া পত্রযোগে এক জন বিশ্বাসপরায়ণ বান্ধবের ঘাড়ে সেই অকর্মণ্য অপদার্থকে নিক্ষেপ করিলেন। আর এক জন হতভাগ্য অগ্রে তাঁহার কাছে না গিয়া পাঁচুবাবুর কাছে গিয়াছিল, এই অপরাধে তাহাকে কানা কড়ি সাহায্য করা চুলায় যাক, বাক্যযন্ত্রণায় তাহাকে নাকের জলে চোখের জলে করিয়া তবে ছাড়িয়া দিলেন। আপনার স্থূল উদরটুকু ধারণ করিয়া এবং উদরের চতুষ্পার্শ্বে সহচর-অনুচরগণকে

চক্রাকারে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যে ব্যক্তি বিপুল শনিগ্রহের মতো বিরাজ করিতে থাকে আমাদের এখানে সে ব্যক্তি এক জন মহৎ লোক। উদারতার সীমা উদরের চারি পার্শ্বের মধ্যেই অবসিত। আমাদের মহত্ত্ব ব্যাপক দেশে ব্যাপক কালে স্থান পায় না। অত কথায় কাজ কী, উদার মহত্ত্বকে আমরা কোনোমতে বিশ্বাস করিতে পারি না। যদি দেখি কোনো এক ব্যক্তি টাকাকড়ির দিকে খুব বেশি মনোযোগ না দিয়া খানিকটা করিয়া সময় দেশের কাজে ব্যয় করে, তবে তাহাকে বলি "হুজুকে।" আমাদের স্ফীত ক্ষুদ্রত্বের নিকট বড়ো কাজ একটা হুজুক বই আর কিছুই নয়। আমরা টাকাকড়ি ক্ষুধাতৃষ্ণা এ সকলের একটা অর্থ বুঝিতে পারি, ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির বশে এবং সংকীর্ণ কর্তব্যজ্ঞানে কাজ করাকেই বুদ্ধিমান প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির লক্ষণ বলিয়া জানি—কিন্তু মহৎ কার্যের উৎসাহে আত্মসমর্পণ করার কোনো অর্থই আমরা খুঁজিয়া পাই না। আমরা বলি, ও ব্যক্তি দল বাঁধিবার জন্য বা নাম করিবার জন্য বা কোনো একটা গোপনীয় উপায়ে অর্থ উপার্জন করিবার জন্য এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে—স্পষ্ট করিয়া কিছু যদি না বলিতে পারি তো বলি, ওর একটা মতলব আছে। মতলব তো আছেই। কিন্তু মতলব মানে কি কেবলই নিজের উদর বা অহংকার তৃপ্তি, ইহা ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোনো উচ্চতর মতলব আমরা কি কল্পনাও করিতে পারি না। এমনি আমাদের জাতির হৃদয়গত বদ্ধমূল ক্ষুদ্রতা। কিন্তু এদিকে দেখো রামহরি বা কালাচাঁদের উপকারের জন্য কেহ প্রাণপণ করিতেছে এরূপ নিঃস্বার্থ ভাব দেখিলে আমরা তাহার প্রশংসা করিয়াই থাকি, অথচ, মানবজাতির উপকারের জন্য আপিস কামাই করা—এরূপ অবিশ্বাসজনক হাস্যজনক প্রস্তাব আপিসকোটরবাসী ক্ষুদ্র বাঙালি-পেচকের নিকটে নিতান্ত রহস্য বলিয়া বোধ হয়। সামাজিক প্রবন্ধ দেখিলে বাঙালি পাঠকেরা ক্রমাগত ঘ্রাণ করিয়া করিয়া সন্ধান করিতে থাকে ইহা কোন্ ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে লিখিত। সমাজের কোনো কুরুচি বা কদাচারের বিরুদ্ধে কেহ যে রাগ করিতে পারে ইহা তেমন সম্ভব বোধ হয় না—এই উপলক্ষ্য করিয়া কোনো শত্রুর প্রতি আক্রমণ করা ইহাই একমাত্র যুক্তিসংগত, মনুষ্য-স্বভাব অর্থাৎ বাঙালি-স্বভাব-সংগত বলিয়া সকলের বোধ হয়। এই জন্য অনেক বাংলা কাগজে ব্যক্তিবিশেষের কথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া উঞ্ছবৃত্তি করা হয়—যাকে তাকে ধরিয়া তাহার উকুন বাছিয়া বা উকুন বাছিবার ভান করিয়া বাঙালি দর্শক-সাধারণের পরম আমোদ উৎপাদন করা হয়।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই তো বলিয়াছিলাম আমরা ব্যক্তির জন্য আত্মবিসর্জন করিতেও পারি, কিন্তু মহৎ ভাবের জন্য সিকি পয়সাও দিতে পারি না। আমরা কেবল

ঘরে বসিয়া বড়ো কথা লইয়া হাসিতামাশা করিতে পারি, বড়ো লোককে লইয়া বিদ্রূপ করিতে পারি, তার পরে ফুড়ফুড় করিয়া খানিকটা তামাক টানিয়া তাস খেলিতে বসি। আমাদের কী হবে তাই ভাবি। অথচ ঘরে বসিয়া আমাদের অহংকার অভিমান খুব মোটা হইতেছে। আমরা ঠিক দিয়া রাখিয়াছি আমরা সমুদয় সভ্য জাতির সমকক্ষ। আমরা না পড়িয়া পণ্ডিত, আমরা না লড়িয়া বীর, আমরা ধাঁ করিয়া সভ্য, আমরা ফাঁকি দিয়া পেট্রিয়ট— আমাদের রসনার অদ্ভুত রাসায়নিক প্রভাবে জগতে যে তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হইবে আমরা তাহারই জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি; সমস্ত জগৎও সেই দিকে সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিয়া আছে। দাদামশায়, আর হরিশ্চন্দ্র-রামচন্দ্র-দধীচির কথা পাড়িয়া ফল কী বলো শুনি। উহাতে আমাদের ফুটন্ত বাগ্মিতার মুখে ফোড়ন দেওয়া হয় মাত্র—আর কী হয়।

আমরা কেবল আপনাকে একে ওকে তাকে এবং এটা ওটা সেটা লইয়া মহা ধুমধাম ছটফট বা খুঁতখুঁত করিয়া বেড়াইতেছি—প্রকৃত বীরত্ব, উদার মনুষ্যত্ব, মহত্ত্বের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, জীবনের গুরুতর কর্তব্য সাধনের জন্য হৃদয়ের অনিবার্য আবেগ, ক্ষুদ্র বৈষয়িকতার অপেক্ষা সহস্র গুণ শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ—এ-সকল আমাদের দেশে কেবল কথার কথা হইয়া রহিল—দ্বার নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া জাতির হৃদয়ের মধ্যে ইহারা প্রবেশ করিতে পারিল না, কেবল বাষ্পময় ভাষার প্রতিমাগুলি আমাদের সাহিত্যে কুজ্ঝটিকা রচনা করিতে লাগিল।

আমরা আশা করিয়া আছি ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এ-সকল সংকীর্ণতা ক্রমে আমাদের মন হইতে দূর হইয়া যাইবে। এই শিক্ষার প্রতি বিরাগ জন্মাইয়া দিয়া ইহার অভ্যন্তরস্থিত ভালো জিনিসটুকু দেখিবার পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়া বোধ হয় না।

সেবক

শ্রীনবীনকিশোর শর্মণঃ

চিরঞ্জীবেষু

তোমার চিঠি পড়িয়া বড়ো খুশি হইলাম। বাস্তবিক, বাঙালিজাতি যেরূপ চালাকি করিতে শিখিয়াছে, তাহাতে তাহাদের কাছে কোনো গম্ভীর বিষয় বলিতে বা কোনো শ্রদ্ধাস্পদের নাম করিতে মনের মধ্যে সংকোচ উপস্থিত হয়। আমাদের এক কালে গৌরবের দিন ছিল, আমাদের দেশে এক কালে বড়ো বড়ো বীর সকল জন্মিয়া-

ছিলেন—কিন্তু বাঙালির কাছে ইহার কোনো ফল হইল না। তাহারা কেবল ভীষ্ম-দ্রোণ-ভীমার্জুনকে পুরাতত্ত্বের কুলুঙ্গি হইতে পাড়িয়া ধুলা ঝাড়িয়া সভাস্থলে পুতুলনাচ দেখায়। আসল কথা, ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণ আমাদের দেশে মরিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যে বাতাসে ছিলেন, সে বাতাস এখন আর নাই। স্মৃতিতে বাঁচিতে হইলেও তাহার খোরাক চাই। নাম মনে করিয়া রাখা তো স্মৃতি নহে, প্রাণ ধরিয়া রাখাই স্মৃতি। কিন্তু প্রাণ জাগাইয়া রাখিতে হইলেই তাহার উপযোগী বাতাস চাই, তাহার উপযোগী খাদ্য চাই। আমাদের হৃদয়ের তপ্ত রক্ত সেই স্মৃতির শিরার মধ্যে প্রবাহিত হওয়া চাই। মনুষ্যত্বের মধ্যেই ভীষ্ম-দ্রোণ বাঁচিয়া আছেন। আমরা তো নকল মানুষ। অনেকটা মানুষের মতো। ঠিক মানুষের মতো খাওয়াদাওয়া করি, চলিয়া ফিরিয়া বেড়াই, হাই তুলি ও ঘুমোই—দেখিলে কে বলিবে যে মানুষ নই। কিন্তু ভিতরে মনুষ্যত্ব নাই। যে জাতির মজ্জার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে, সে জাতির মহত্ত্বকে কেহ অবিশ্বাস করিতে পারে না, মহৎ আশাকে কেহ গাঁজাখুরি মনে করিতে পারে না, মহৎ অনুষ্ঠানকে কেহ হুজুক বলিতে পারে না, সেখানে সংকল্প কার্য হইয়া উঠে, কার্য সিদ্ধিতে পরিণত হয়; সেখানে জীবনের সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পায়। সে জাতিতে সৌন্দর্য ফুলের মতো ফুটিয়া উঠে, বীরত্ব ফলের মতো পক্বতা প্রাপ্ত হয়। আমার বিশ্বাস, আমরা যতই মহত্ত্ব উপার্জন করিতে থাকিব, আমাদের হৃদয়ের বল যতই বাড়িয়া উঠিবে, আমাদের দেশের বীরগণ ততই পুনর্জীবন লাভ করিবেন। পিতামহ ভীষ্ম আমাদের মধ্যে বাঁচিয়া উঠিবেন। আমাদের সেই নূতন জীবনের মধ্যে আমাদের দেশের প্রাচীন জীবন জীবন্ত হইয়া উঠিবে। নতুবা মৃত্যুর মধ্যে জীবনের উদয় হইবে কী করিয়া। বিদ্যুৎপ্রয়োগে মৃতদেহ জীবিতের মতো কেবল অঙ্গভঙ্গি ও মুখভঙ্গি করে মাত্র। আমাদের দেশে সেই বিচিত্র ভঙ্গিমার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কিন্তু হায় হায়, কে আমাদিগকে এমন করিয়া নাচাইতেছে। কেন আমরা ভুলিয়া যাইতেছি যে আমরা নিতান্ত অসহায়। আমাদের এত সব উন্নতির মূল কোথায়। এ সব উন্নতি রাখিব কিসের উপরে। রক্ষা করিব কী উপায়ে। একটু নাড়া খাইলেই দিনদুয়ের সুখস্বপ্নের মতো সমস্তই যে কোথায় বিলীন হইয়া যাইবে। অন্ধকারের মধ্যে বঙ্গদেশের উপরে ছায়াবাজির উজ্জ্বল ছায়া পড়িয়াছে, তাহাকেই স্থায়ী উন্নতি মনে করিয়া আমরা ইংরেজি ফেশানে করতালি দিতেছি। উন্নতির চাকচিক্য লাভ করিয়াছি কিন্তু উন্নতিকে ধারণ করিবার, পোষণ করিবার ও রক্ষা করিবার বিপুল বল কই লাভ করিতেছি। আমাদের হৃদয়ের মধ্যে চাহিয়া দেখো, সেখানে সেই জীর্ণতা, দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতা, ক্ষুদ্রতা, অসত্য, অভিমান, অবিশ্বাস, ভয়। সেখানে চপলতা, লঘুতা,

আলস্য, বিলাস, । দৃঢ়তা নাই, উদ্যম নাই। কারণ সকলেই মনে করিতেছেন, সিদ্ধি হইয়াছে, সাধনার আবশ্যক নাই। কিন্তু যে-সিদ্ধি সাধনা ব্যতীত হইয়াছে তাহাকে কেহ বিশ্বাস করিয়ো না।- তাহাকে তোমার বলিয়া মনে করিতেছ কিন্তু সে কখনোই তোমার নহে। আমরা উপার্জন করিতে পারি, কিন্তু লাভ করিতে পারি না। আমরা জগতের সমস্ত জিনিসকে যত ক্ষণ না আমার মধ্যে ফেলিয়া আমার করিয়া লইতে পারি, তত ক্ষণ আমরা কিছুই পাই না। ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িলেই তাহাকে পাওয়া বলে না। আমাদের চক্ষের স্নায়ু সূর্যকিরণকে আমাদের উপযোগী আলো-আকারে গড়িয়া লয়, তা না হইলে আমরা অন্ধ; আমাদের অন্ধ চক্ষুর উপরে সহস্র সূর্যকিরণ পড়িলেও কোনো ফল নাই। আমাদের হৃদয়ের সেই স্নায়ু কোথায়। এ পক্ষাঘাতের আরোগ্য কিসে হইবে। আমরা সাধনা কেন করি না। সিদ্ধির জন্য আমাদের মাথাব্যথা নাই বলিয়া। সেই মাথাব্যথাটা গোড়ায় চাই।

অর্থাৎ, বাতিকের আবশ্যক। আমাদের শ্লেষ্মাপ্রধান ধাত, আমাদের বাতিকটা আদবেই নাই। আমরা ভারি ভদ্র, ভারি বুদ্ধিমান, কোনো বিষয়ে পাগলামি নাই। আমরা পাশ করিব, রোজগার করিব, ও তামাক খাইব। আমরা এগোইব না, অনুসরণ করিব; কাজ করিব না, পরামর্শ দিব; দাঙ্গাহাঙ্গামাতে নাই, কিন্তু মকদ্দমা-মামলা ও দলাদলিতে আছি। অর্থাৎ হাঙ্গামের অপেক্ষা হুজ্জতটা আমাদের কাছে যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়। লড়াইয়ের অপেক্ষা পলায়নেই পিতৃযশ রক্ষা হয় এইরূপ আমাদের বিশ্বাস। এইরূপ আত্যন্তিক স্নিগ্ধ ভাব ও মজ্জাগত শ্লেষ্মার প্রভাবে নিদ্রাটা আমাদের কাছে পরম রমণীয় বলিয়া বোধ হয়, স্বপ্নটাকেই সত্যের আসনে বসাইয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করি।

অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে আমাদের প্রধান আবশ্যক বাতিক। সেদিন এক জন বৃদ্ধ বাতিকগ্রস্তের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। তিনি বায়ুভরে একেবারে কাত হইয়া পড়িয়াছেন—এমন কি অনেক সময়ে বায়ুর প্রকোপ তাঁহার আয়ুর প্রতি আক্রমণ করে। তাঁহার সহিত অনেক ক্ষণ আলোচনা করিয়া স্থির করিলাম, যে, "আর কিছু না, আমাদের দেশে একটি বাতিকবর্ধনী সভার আবশ্যক হইয়াছে।" সভার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, কতকগুলা ভালোমানুষের ছেলেকে খেপাইতে হইবে। বাস্তবিক, প্রকৃত খেপা ছেলেকে দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

বায়ুর মাহাত্ম্য কে বর্ণনা করিতে পারে। যে-সকল জাত উনবিংশ শতাব্দীর পরে উনপঞ্চাশ বায়ু লাগাইয়া চলিয়াছেন, আমরা সাবধানীরা কবে তাহাদের নাগাল

পাইব। আমাদের যে অল্প একটু বায়ু আছে, সভার নিয়ম রচনা করিতে ও বক্তৃতা দিতেই তাহা নিঃশেষিত হইয়া যায়।

মহৎ আশা, মহৎ ভাব, মহৎ উদ্দেশ্যকে সাবধান বিষয়ী লোকেরা বাষ্পের ন্যায় জ্ঞান করেন। কিন্তু এই বাষ্পের বলেই উন্নতির জাহাজ চলিতেছে, এই বাষ্পকে খাটাইতে হইবে, এই বায়ুকে পালে আটক করিতে হইবে। এমন তুমুল শক্তি আর কোথায় আছে। আমাদের দেশে এই বাষ্পের অভাব বায়ুর অভাব। আমরা উন্নতির পালে একটুখানি ফুঁ দিতেছি, যতখানি গাল ফুলিতেছে ততখানি পাল ফুলিতেছে না।

বৃহৎ ভাবের নিকটে আত্মবিসর্জন করাকে যদি পাগলামি বলে তবে সেই পাগলামি এক কালে প্রচুর পরিমাণে আমাদের ছিল। ইহাই প্রকৃত বীরত্ব। কর্তব্যের অনুরোধে রাম যে রাজ্য ছাড়িয়া বনে গেলেন তাহাই বীরত্ব, এবং সীতা ও লক্ষ্মণ যে তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন, তাহাও বীরত্ব। ভরত যে রামকে ফিরাইয়া আনিতে গেলেন, তাহা বীরত্ব, এবং হনুমান যে প্রাণপণে রামের সেবা করিয়াছিলেন, তাহাও বীরত্ব। হিংসা অপেক্ষা ক্ষমায় যে অধিক বীরত্ব, গ্রহণের অপেক্ষা ত্যাগে অধিক বীরত্ব, এই কথাই আমাদের কাব্যে ও শাস্ত্রে বলিতেছে। পালোয়ানিকে আমাদের দেশে সর্বাপেক্ষা বড়ো জ্ঞান করিত না। এইজন্য বাল্মীকির রাম রাবণকে পরাজিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, রাবণকে ক্ষমা করিয়াছেন। রাম রাবণকে দুই বার জয় করিয়াছেন। এক বার বাণ মারিয়া, এক বার ক্ষমা করিয়া। কবি বলেন, তন্মধ্যে শেষের জয়ই শ্রেষ্ঠ। হোমরের একিলিস পরাভূত হেক্টরের মৃতদেহ ঘোড়ার লেজে বাঁধিয়া শহর প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন, রামে একিলিসে তুলনা করো। য়ুরোপীয় মহাকবি হইলে পাণ্ডবদের যুদ্ধজয়েই মহাভারত শেষ করিতেন, কিন্তু আমাদের ব্যাস বলিলেন, রাজ্য গ্রহণ করায় শেষ নহে রাজ্য ত্যাগ করায় শেষ। যেখানে সব শেষ তাহাই আমাদের লক্ষ্য ছিল। কেবল তাহাই নহে, আমাদের কবিরা পুরস্কারেরও লোভ দেখান নাই। ইংরেজেরা য়ুটিলিটেরিয়ান কতকটা দোকানদার, তাই তাঁহাদের শাস্ত্রে পোয়েটিক্যাল জাস্টিস নামক একটা শব্দ আছে, তাহার অর্থ দেনাপাওনা, সৎকাজের দর-দাম করা। আমাদের সীতা চিরদুঃখিনী, রাম-লক্ষ্মণের জীবন দুঃখে কষ্টে শেষ হইল। এত বড়ো অর্জুনের বীরত্ব কোথায় গেল, অবশেষে দস্যুদল আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে যাদব-রমণীদের কাড়িয়া লইয়া গেল, তিনি গাণ্ডীব তুলিতে পারিলেন না। পঞ্চপাণ্ডবের সমস্ত জীবন দারিদ্র্যে দুঃখে শোকে অরণ্যে কাটিয়া গেল, শেষেই বা কী সুখ পাইলেন। হরিশ্চন্দ্র যে এত কষ্ট পাইলেন, এত ত্যাগ করিলেন, অবশেষে কবি

তাঁহার কাছ হইতে পুণ্যের শেষ পুরস্কার স্বর্গও কাড়িয়া লইলেন। ভীষ্ম যে রাজপুত্র হইয়া সন্ন্যাসীর মতো জীবন কাটাইলেন, তাঁহার সমস্ত জীবনে সুখ কোথায়। সমস্ত জীবন যিনি আত্মত্যাগের কঠিন শয্যায় শুইয়াছিলেন মৃত্যুকালে তিনি শরশয্যায় বিশ্রাম লাভ করিলেন।

এক কালে মহৎ ভাবের প্রতি আমাদের দেশের লোকের এত বিশ্বাস এত নিষ্ঠা ছিল। তাঁহারা মহত্ত্বকেই মহত্ত্বের পরিণাম বলিয়া জানিতেন, ধর্মকেই ধর্মের পুরস্কার জ্ঞান করিতেন।

আর আজকাল। আজকাল আমাদের এমনি হইয়াছে যে, কেরানিগিরি ছাড়া আর কিছুরই উপরে আমাদের বিশ্বাস নাই—এমন কি বাণিজ্যকেও পাগলামি জ্ঞান করি। দরখাস্তকে ভবসাগরের তরণী করিয়াছি, নাম সহি করিয়া আপনাকে বীর মনে করিয়া থাকি।

আজ তোমাতে আমাতে ভাব হইল ভাই। মহত্ত্বের একাল আর সেকাল কী। যাহা ভালো তাহাই আমাদের হৃদয় গ্রহণ করুক, যেখানে ভালো সেখানেই আমাদের হৃদয় অগ্রসর হউক। আমাদের লঘুতা, চপলতা, সংকীর্ণতা, দূরে যাক। অজ্ঞতা ও ক্ষুদ্রতা হইতে প্রসূত বাঙালিসুলভ অভিমানে মোটা হইয়া চক্ষু রুদ্ধ করিয়া আপনাকে সকলের চেয়ে বড়ো মনে না করি ও মহৎ হইবার আগে দেশ-কাল-পাত্র-নির্বিশেষে মহতের চরণের ধূলি লইতে পারি এমন বিনয় লাভ করি।

শুভাশীর্বাদক
শ্রীষষ্ঠীচরণ দেবশর্মণঃ

৬

শ্রীচরণেষু

দাদামহাশয়, এবার কিছুদিন ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। এই সুদূরবিস্তৃত মাঠ এই অশোকের ছায়ায় বসিয়া আমাদের সেই কলিকাতা শহরকে একটা মস্ত ইটের খাঁচা বলিয়া মনে হইতেছে। শতসহস্র মানুষকে একটা বড়ো খাঁচায় পুরিয়া কে যেন হাটে হাটে বিক্রয় করিতে আনিয়াছে। স্বভাবের গীত ভুলিয়া সকলেই কিচিকিচি ও খোঁচাখুঁচি করিয়া মরিতেছে। আমি সেই খাঁচা ছাড়িয়া উড়িয়াছি, আমি হাটে বিকাইতে চাহি না।

গাছপালা নহিলে আমি তো বাঁচি না—আমি ষোলো আনা 'ভেজিটেরিয়ান'।

আমি কায়মনে উদ্ভিদ সেবন করিয়া থাকি। ইটকাঠ চুনসুরকি মৃত্যু-ভারের মতো আমার উপর চাপিয়া থাকে। হৃদয় পলে পলে মরিতে থাকে। বড়ো বড়ো ইমারত-গুলো তাহাদের শক্ত শক্ত কড়িবরগা মেলিয়া হাঁ করিয়া আমাকে গিলিয়া ফেলে। প্রকাণ্ড কলিকাতাটার কঠিন জঠরের মধ্যে আমি যেন একেবারে হজম হইয়া যাই। কিন্তু এখানে এই গাছপালার মধ্যে প্রাণের হিল্লোল। হৃদয়ের মধ্যে যেখানে জীবনের সরোবর আছে, প্রকৃতির চারি দিক হইতে সেখানে জীবনের স্রোত আসিয়া মিশিতে থাকে।

বঙ্গদেশ এখান হইতে কত শত ক্রোশ দূরে। কিন্তু এখান হইতে বঙ্গভূমির এক নূতন মূর্তি দেখিতে পাইতেছি। যখন বঙ্গদেশের ভিতরে বাস করিতাম, তখন বঙ্গদেশের জন্য বড়ো আশা হইত না। তখন মনে হইত বঙ্গদেশ গোঁফে তেল গাছে কাঁঠালের দেশ। যত বড়ো না মুখ তত বড়ো কথার দেশ। পেটে পিলে, কানে কলম ও মাথায় শামলার দেশ। মনে হইত এখানে বিচিগুলাই দেখিতে দেখিতে তেরো হাত হইয়া কাঁকুড়কে অতিক্রম করিয়া উঠে। এখানে পাড়াগেঁয়ে ছেলেরা হাত-পা নাড়িয়া কেবল একটা প্রহসন অভিনয় করিতেছে, এবং মনে করিতেছে দর্শকেরা শুদ্ধ কেবল আড়ি করিয়া হাসিতেছে, হাসির কোনো যুক্তিসংগত কারণ নাই। কিন্তু আজি এই সহস্র ক্রোশ ব্যবধান হইতে বঙ্গভূমির মুখের চতুর্দিকে এক অপূর্ব জ্যোতির্মণ্ডল দেখিতে পাইতেছি। বঙ্গদেশ আজ মা হইয়া বসিয়াছেন, তাঁহার কোলে বঙ্গবাসী নামে এক সুন্দর শিশু—তিনি হিমালয়ের পদপ্রান্তে সাগরের উপকূলে তাঁহার শ্যামল কানন তাঁহার পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহার গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের তীরে এই শিশুটি কোলে করিয়া লালন করিতেছেন। এই সন্তানের মুখের দিকে মাতা অবনত হইয়া চাহিয়া আছেন, ইহাকে দেখিয়া তাঁহার মুখে আশা ও আনন্দের আভা দীপ্তি পাইয়া উঠিয়াছে। সহস্র ক্রোশ অতিক্রম করিয়া আমি মায়ের মুখের সেই আশার আলোক দেখিতে পাইতেছি। আমি আশ্বাস পাইতেছি এ সন্তান মরিবে না। বঙ্গভূমি এই সন্তানটিকে মানুষ করিয়া ইহাকে এক দিন পৃথিবীর কাজে উৎসর্গ করিতে পারিবেন। বঙ্গভূমির কোল হইতে আজ মাঝে মাঝে শিশুর হাসি শিশুর ক্রন্দন শুনিতেছি—বঙ্গভূমির সহস্র নিকুঞ্জ এত দিন নিস্তব্ধ ছিল, বঙ্গভবনে শিশুর কণ্ঠধ্বনি এত দিন শুনা যায় নাই, এত দিন এই ভাগীরথীর উভয় তীর কেবল শ্মশান বলিয়া মনে হইত। আজ বঙ্গভূমির আনন্দ-উৎসব ভারতবর্ষের চারি দিক হইতে শুনা যাইতেছে,। আজ ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে যে নব জাতির জন্ম-সংগীত গান হইতেছে, ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে পশ্চিমঘাটগিরির সীমান্তদেশে বসিয়া আমি তাহা শুনিতে পাইতেছি। বঙ্গদেশের

মধ্যে থাকিয়া যাহা কেবলমাত্র অর্থহীন কোলাহল মনে হইত এখানে তাহার এক বৃহৎ অর্থ দেখিতে পাইতেছি। এই দূর হইতে বঙ্গদেশের কেবল বর্তমান নহে ভবিষ্যৎ, প্রত্যক্ষ ঘটনাগুলিমাত্র নহে সুদূর সম্ভাবনাগুলি পর্যন্ত দেখিতে পাইতেছি। তাই আমার হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় আশার সঞ্চার হইতেছে।

মনের আবেগে কথাগুলো কিছু বড়ো হইয়া পড়িল। তোমার আবার বড়ো কথা সয় না। ছোটোকথা সম্বন্ধে তোমার কিঞ্চিৎ গোঁড়ামি আছে—সেটা ভালো নয়। যাই হ'ক তোমাকে বক্তৃতা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। আসল কথা কী জান। এত দিন বঙ্গদেশ শহরতলিতে পড়িয়াছিল, এখন আমাদিগকে শহরভুক্ত করিবার প্রস্তাব আসিয়াছে। ইহা আমি গোপনে সংবাদ পাইয়াছি। এখন আমরা মানবসমাজ নামক বৃহৎ মিউনিসিপ্যালিটির জন্য ট্যাক্স দিবার অধিকারী হইয়াছি! আমরা পৃথিবীর রাজধানীভুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছি। আমরা রাজধানীকে কর দিব এবং রাজধানীর কর আদায় করিব।

মানুষের জন্য কাজ না করিলে মানুষের মধ্যে গণ্য হওয়া যায় না। একদেশবাসীর মধ্যে যেখানে প্রত্যেকেই সকলের প্রতিনিধিস্বরূপ, সকলের দায় সকলেই নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করে, সেখানেই প্রকৃতরূপে জাতির সৃষ্টি হইয়াছে বলিতে হইবে। আর যাঁহারা স্বজাতিকে অতিক্রম করিয়া মানব-সাধারণের জন্য কাজ করেন তাঁহারা মানবজাতির মধ্যে গণ্য। আমরা স্বজাতি ও মানবজাতির জন্য কাজ করিতে পারিব বলিয়া কি আশ্বাস জন্মিতেছে না। আমাদের মধ্যে এক বৃহৎ ভাবের বন্যা আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, আমাদের রুদ্ধ দ্বারে আসিয়া আঘাত করিতেছে, আমাদিগকে সর্বসাধারণের সহিত একাকার করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। অনেকে বিলাপ করিতেছে, "সমস্ত 'একাকার' হইয়া গেল"—কিন্তু আমার মনে আজ এই বলিয়া আনন্দ হইতেছে যে, আজ সমস্ত 'একাকার' হইবারই উপক্রম হইয়াছে বটে। আমরা যখন বাঙালি হইব তখন এক বার 'একাকার' হইবে, আর বাঙালি যখন মানুষ হইবে তখন আরও 'একাকার' হইবে। বিপুল মানবশক্তি বাংলা সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছে ইহা আমি দূর হইতে দেখিতে পাইতেছি। ইহার প্রভাব অতিক্রম করিতে কে পারে। এ আমাদের সংকীর্ণতা আমাদের আলস্য ঘুচাইয়া তবে ছাড়িবে। আমাদের মধ্যে বৃহৎ প্রাণ সঞ্চার করিয়া সেই প্রাণ পৃথিবীর সহিত যোগ করিয়া দিবে। আমাদিগকে তাহার দূত করিয়া পৃথিবীতে নূতন নূতন সংবাদ প্রেরণ করিবে। আমাদের দ্বারা তাহার কাজ করাইয়া লইয়া তবে নিস্তার। আমার মনে নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে, বাঙালিদের একটা কাজ আছেই। আমরা নিতান্ত পৃথিবীর

অন্নধ্বংস করিতে আসি নাই। আমাদের লজ্জা এক দিন দূর হইবে। ইহা আমরা হৃদয়ের ভিতর হইতে অনুভব করিতেছি।

আমাদের আশ্বাসের কারণও আছে। আমাদের বাঙালির মধ্য হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি তো বিঘাকাঠার মধ্যেই বাস করিতেন না, তিনি তো সমস্ত মানবকে আপনার করিয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত মানবপ্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন তো বাংলা পৃথিবীর এক প্রান্তভাগে ছিল, তখন তো সাম্য ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি কথাগুলোর সৃষ্টি হয় নাই; সকলেই আপন-আপন আহ্নিক তর্পণ ও চণ্ডীমণ্ডপটি লইয়া ছিল—তখন এমন কথা কী করিয়া বাহির হইল—

"মার খেয়েছি না হয় আরও খাব,
তাই বলে কি প্রেম দিব না? আয়!"

এ কথা ব্যাপ্ত হইল কী করিয়া। সকলের মুখ দিয়া বাহির হইল কী করিয়া। আপন-আপন বাঁশবাগানের পার্শ্বস্থ ভদ্রাসনবাটীর মনসা-সিজের বেড়া ডিঙাইয়া পৃথিবীর মাঝখানে আসিতে কে আহ্বান করিল, এবং সে আহ্বানে সকলে সাড়া দিল কী করিয়া। এক দিন তো বাংলাদেশে ইহাও সম্ভব হইয়াছিল। এক জন বাঙালি আসিয়া এক দিন বাংলা দেশকে তো পথে বাহির করিয়াছিল। একজন বাঙালি তো এক দিন সমস্ত পৃথিবীকে পাগল করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং বাঙালিরা সেই ষড়যন্ত্রে তো যোগ দিয়াছিল। বাংলার সে এক গৌরবের দিন। তখন বাংলা স্বাধীনই থাকুক আর অধীনই থাকুক, মুসলমান নবাবের হাতেই থাকুক আর স্বদেশীয় রাজার হাতেই থাকুক, তাহার পক্ষে সে একই কথা। সে আপন তেজে আপনি তেজস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।

আসল কথা বাংলায় সেই এক দিন সমস্ত একাকার হইবার জো হইয়াছিল। তাই কতকগুলো লোক খেপিয়া চৈতন্যকে কলসীর কানা ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল। কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। কলসীর কানা ভাসিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে এমনি একাকার হইল যে, জাতি রহিল না, কুল রহিল না, হিন্দু-মুসলমানেও প্রভেদ রহিল না। তখন তো আর্যকুলতিলকেরা জাতিভেদ লইয়া তর্ক তুলে নাই। আমি তো বলি তর্ক করিলেই তর্ক উঠে। বৃহৎ ভাব যখন অগ্রসর হইতে থাকে তখন তর্কবিতর্ক খুঁটিনাটি সমস্তই অচিরাৎ আপন-আপন গর্তের মধ্যে সুড়সুড় করিয়া প্রবেশ করে। কারণ মরার বাড়া আর গাল নাই। বৃহৎ ভাব আসিয়া বলে, সুবিধা-অসুবিধার কথা হইতেছে না আমার জন্য সকলকে মরিতে হইবে। লোকেও তাহার আদেশ শুনিয়া মরিতে বসে। মরিবার সময় খুঁটিনাটি লইয়া তর্ক করে কে বলো।

চৈতন্য যখন পথে বাহির হইলেন তখন বাংলা দেশের গানের সুর পর্যন্ত ফিরিয়া গেল। তখন এককণ্ঠবিহারী বৈঠকি সুরগুলো কোথায় ভাসিয়া গেল। তখন সহস্র হৃদয়ের তরঙ্গ-হিল্লোল সহস্র কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত করিয়া নূতন সুরে আকাশে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তখন রাগরাগিণী ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল, এক জনকে ছাড়িয়া সহস্র জনকে বরণ করিল। বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য কীর্তন বলিয়া এক নূতন কীর্তন উঠিল। যেমন ভাব তেমনি তাহার কণ্ঠস্বর—অশ্রুজলে ভাসাইয়া সমস্ত একাকার করিবার জন্য ক্রন্দনধ্বনি। বিজন কক্ষে বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া একটিমাত্র বিরহিণীর বৈঠকি কান্না নয়, প্রেমে আকুল হইয়া নীলাকাশের তলে দাঁড়াইয়া সমস্ত বিশ্বজগতের ক্রন্দনধ্বনি।

তাই আশা হইতেছে, আর এক দিন হয়তো আমরা একই মত্ততায় পাগল হইয়া সহসা এক জাতি হইয়া উঠিতে পারিব। বৈঠকখানার আসবাব ছাড়িয়া সকলে মিলিয়া রাজপথে বাহির হইতে পারিব। বৈঠকি ধ্রুপদ খেয়াল ছাড়িয়া রাজপথী কীর্তন গাহিতে পারিব। মনে হইতেছে এখনি বঙ্গদেশের প্রাণের মধ্যে একটি বৃহৎ কথা প্রবেশ করিয়াছে, একটি আশ্বাসের গান ধ্বনিত হইতেছে, তাই সমস্ত দেশটা মাঝে মাঝে টলমল করিয়া উঠিতেছে। এ যখন জাগিয়া উঠিবে তখন আজিকার দিনের এই সকল সংবাদপত্রের মেকি সংগ্রাম, শতসহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তর্কবিতর্ক ঝগড়াঝাঁটি সমস্ত চুলায় যাইবে, আজিকার দিনের বড়ো বড়ো ছোটোলোকদিগের নখে-আঁকা গণ্ডিগুলি কোথায় মিলাইয়া যাইবে। সেই আর এক দিন বাংলা একাকার হইবে।

প্রকৃত স্বাধীনতা ভাবের স্বাধীনতা। বৃহৎ ভাবের দাস হইলেই আমরা স্বাধীনতার প্রকৃত সুখ ও গৌরব অনুভব করিতে পারি। তখন কেই বা রাজা কেই বা মন্ত্রী। তখন একটা উঁচু সিংহাসনমাত্র গড়িয়া আমাদের চেয়ে কেহ উঁচু হইতে পারে না। সেই গৌরব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলেই আমাদের সহস্র বৎসরের অপমান দূর হইয়া যাইবে, আমরা সকল বিষয়ে স্বাধীন হইবার যোগ্য হইব।

আমাদের সাহিত্য যদি পৃথিবীর সাহিত্য হয়, আমাদের কথা যদি পৃথিবীর কাজে লাগে, এবং সে-সূত্রেও যদি বাংলার অধিবাসীরা পৃথিবীর অধিবাসী হইতে পারে—তাহা হইলেও আমাদের মধ্যে গৌরব জন্মিবে—হীনতা ধুলার মতো আমরা গা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিব।

কেবলমাত্র বন্দুক ছুঁড়িতে পারিলেই যে আমরা বড়োলোক হইব তাহা নহে, পৃথিবীর কাজ করিতে পারিলে তবে আমরা বড়োলোক হইব। আমার তো আশা

হইতেছে আমাদের মধ্যে এমন সকল বড়োলোক জন্মিবেন যাঁহারা বঙ্গদেশকে পৃথিবীর মানচিত্রের শামিল করিবেন ও এইরূপে পৃথিবীর সীমানা বাড়াইয়া দিবেন।

তুমি নাকি বড়ো চিঠি পড় না তাই ভয় হইতেছে পাছে এই চিঠি ফেরত দিয়া ইহার সংক্ষেপে মর্ম লিখিয়া পাঠাইতে অনুরোধ কর। কিন্তু তুমি পড় আর নাই পড় আমি লিখিয়া আনন্দলাভ করিলাম। এ যেন আমিই আমাকে চিঠি লিখিলাম, এবং পড়িয়া সম্পূর্ণ পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম।

সেবক
শ্রীনবীনকিশোর শর্মণঃ

৭

চিরঞ্জীবেষু

ভায়া, আমাদের সেকালে পোস্টাফিসের বাহুল্য ছিল না—জরুরি কাজের চিঠি ছাড়া অন্য কোনো প্রকার চিঠি হাতে আসিত না, এই জন্য সংক্ষেপ চিঠি পড়াই আমাদের অভ্যাস। তা ছাড়া বুড়ামানুষ—প্রত্যেক অক্ষর বানান করিয়া করিয়া পড়িতে হয়; বড়ো চিঠি পড়িতে ডরাই—সে কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু তোমার চিঠি পড়িয়া দীর্ঘ পত্র পড়ার দুঃখ আমার সমস্ত দূর হইল। তুমি যে হৃদয়পূর্ণ চিঠি লিখিয়াছ, তাহার সমালোচনা করিতে বসিতে আমার মন সরিতেছে না; কিন্তু বুড়ামানুষের কাজই সমালোচনা করা। যৌবনের সহজ চক্ষুতে প্রকৃতির সৌন্দর্যগুলিই দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু চশমার ভিতর দিয়া কেবল অনেকগুলা খুঁত এবং খুঁটিনাটি চোখে পড়ে।

বিদেশে গিয়া যে, বাঙালি জাতির উন্নতি-আশা তোমার মনে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, তাহার গুটিকতক কারণ আছে। প্রধান কারণ—এখানে তোমার অজীর্ণ রোগ ছিল, সেখানে তোমার খাদ্য জীর্ণ হইতেছে এবং সেই সঙ্গে ধরিয়া লইতেছ যে, বাঙালি মাত্রেরই পেটে অন্ন পরিপাক পাইতেছে—এরূপ অবস্থায় কাহার না আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু আমি অম্লশূল পীড়ায় কাতর বাঙালিসন্তান—তোমার চিঠিটা আমার কাছে আগাগোড়াই কাহিনী বলিয়া ঠেকিতেছে। পেটে আহার জীর্ণ হওয়া এবং না-হওয়ার উপর পৃথিবীর কত সুখদুঃখ মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ভর করে তাহা কেহ ভাবিয়া দেখে না। পাকযন্ত্রের উপর যে-উন্নতির ভিত্তি স্থাপিত হয় নাই সে-উন্নতি কত দিন টিঁকিতে পারে। জঠরানলের প্রখর প্রভাবেই মনুষ্যজাতিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। যে জাতির

ক্ষুধা কম, সে জাতি থাকিলেও হয় গেলেও হয়; তাহার দ্বারা কোনো কাজ হইবে না। যে জাতি আহার করে অথচ হজম করে না, সে-জাতি কখনোই সদ্গতি প্রাপ্ত হইতে পারে না।

বাঙালি জাতির অম্লরোগ হইল বলিয়া কেরানিগিরি ছাড়িতে পারিল না। তাহার সাহস হয় না, আশা হয় না, উদ্যম হয় না। এজন্য বেচারাকে দোষ দেওয়া যায় না, আমাদের শরীর অপটু, বুদ্ধি অপরিপক্ক, উদরান্ন ততোধিক। অতএব সমাজ সংস্কারের ন্যায় পাকযন্ত্র সংস্কারও আমাদের আবশ্যক হইয়াছে।

আনন্দ না থাকিলে উন্নতি হইবে কী করিয়া। আশা উৎসাহ সঞ্চয় করিব কোথা হইতে। অকৃতকার্যকে সিদ্ধির পথে বার বার অগ্রসর করিয়া দিবে কে। আমাদের এই নিরানন্দের দেশে উঠিতে ইচ্ছা করে না, কাজ করিতে ইচ্ছা করে না, একবার পড়িয়া গেলেই মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যায়। প্রাণ না দিলে কোনো কাজ হয় না—কিন্তু প্রাণ দিব কিসের পরিবর্তে। আমাদের প্রাণ কাড়িয়া লইবে কে। আনন্দ নাই, আনন্দ নাই—দেশে আনন্দ নাই, জাতির হৃদয়ে আনন্দ নাই। কেমন করিয়া থাকিবে। আমাদের এই স্বল্পায়ু ক্ষুদ্র শীর্ণ দেহ, অম্লশূলে বিদ্ধ, ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ, রোগের অবধি নাই—বিশ্বব্যাপিনী আনন্দ-সুধার অনন্ত প্রস্রবণধারা আমরা যথেষ্ট পরিমাণে ধারণ করিয়া রাখিতে পারি না—এই জন্য নিদ্রা আর ভাঙে না, এক বার শ্রান্ত হইয়া পড়িলে শ্রান্তি আর দূর হয় না, এক বার কার্য ভাঙিয়া গেলে কার্য আর গঠিত হয় না, এক বার অবসাদ উপস্থিত হইলে তাহা ক্রমাগতই ঘনীভূত হইতে থাকে।

অতএব কেবল মাতিয়া উঠিলেই হইবে না, সেই মত্ততা ধারণ করিয়া রাখিবার, সেই মত্ততা সমস্ত জাতির শিরার মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিবার ক্ষমতা সঞ্চয় করা চাই। একটি স্থায়ী আনন্দের ভাব সমস্ত জাতির হৃদয়ে দৃঢ় বদ্ধমূল হওয়া চাই। এমন এক প্রবল উত্তেজনাশক্তি আমাদের জাতি-হৃদয়ের কেন্দ্রস্থলে অহরহ দণ্ডায়মান থাকে যাহার আনন্দ-উচ্ছ্বাসবেগে আমাদের জীবনের প্রবাহ সহস্র ধারায় জগতের সহস্র দিকে প্রবাহিত হইতে পারে। কোথায় বা সে শক্তি। কোথায় বা তাহার দাঁড়াইবার স্থান। সে শক্তির পদভারে আমাদের এই জীর্ণ দেহ বিদীর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া যায়।

আমি তো তাই ভাবিয়া রাখিয়াছি, যে-দেশের আবহাওয়ায় বেশি মশা জন্মায় সেখানে বড়ো জাতি জন্মিতে পারে না। এই আমাদের জলা জমি জঙ্গল এই কোমল মৃত্তিকার মধ্যে কর্মানুষ্ঠানতৎপর প্রবল সভ্যতার স্রোত আসিয়া আমাদের কাননবেষ্টিত প্রচ্ছন্ন নিভৃত ক্ষুদ্র কুটিরগুলি কেবল ভাঙিয়া দিতেছে মাত্র। আকাঙ্ক্ষা আনিয়া

দিতেছে কিন্তু উপায় নাই, কাজ বাড়াইয়া দিতেছে কিন্তু শরীর নাই, অসন্তোষ আনিয়া দিতেছে কিন্তু উদ্যম নাই। আমাদের যে স্বস্তি ছিল তাহা ভাসাইয়া দিতেছে— তাহার পরিবর্তে যে সুখের মরীচিকা রচনা করিতেছে তাহাও আমাদের দুষ্প্রাপ্য। কাজ করিয়া প্রকৃত সিদ্ধি নাই কেবল অহর্নিশি শ্রান্তিই সার। আমার মনে হয় তার চেয়ে আমরা ছিলাম ভালো—আমাদের সেই স্নিগ্ধ কাননচ্ছায়ায়, পল্লবের মর্মর শব্দে, নদীর কলস্বরে, সুখের কুটিরে স্নেহশীল পিতামাতা, পতিপ্রাণা স্ত্রী, স্বজনবৎসল পুত্রকন্যা, পরিবারপ্রতিম পরিচিত প্রতিবেশীদিগকে লইয়া যে নিরুপদ্রব নীড়টুকু রচনা করিয়াছিলাম, সে ছিলাম ভালো। য়ুরোপীয় বিরাট সভ্যতার পাষাণ-উপকরণ-সকল আমরা কোথায় পাইব। কোথায় সে বিপুল বল, সে শ্রান্তিমোচন জলবায়ু, সে ধুরন্ধর প্রশস্ত ললাট। অবিশ্রাম কর্মানুষ্ঠান, বাধাবিঘ্নের সহিত অবিশ্রাম যুদ্ধ, নূতন নূতন পথের অনুসন্ধানে অবিশ্রাম ধাবন, অসন্তোষানলে অবিশ্রাম দহন—সে আমাদের এই প্রখর রৌদ্রতপ্ত আর্দ্রসিক্ত দেশে জীর্ণশীর্ণ দুর্বল দেহে পারিব কেন। কেবল আমাদের শ্যামল শীতল তৃণনিবাস পরিত্যাগ করিয়া আমরা পতঙ্গের মতো উগ্র সভ্যতানলে দগ্ধ হইয়া মরিব মাত্র।

বালকেরা শুনিবে এবং বৃদ্ধেরা বলিবে এই জন্য তোমাদের কাছে সংক্ষেপে চিঠি প্রত্যাশা করি কিন্তু নিজে বড়ো চিঠি লিখি। অর্বাচীনদের কথা ধৈর্য ধরিয়া বেশি ক্ষণ শুনিতে পারি না, কিন্তু নিজের কথা বলিয়া তৃপ্তি হয় না—অতএব "নিজে যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর অন্যের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিবে" বাইবেলের এই উপদেশ অনুসারে আমার সহিত কাজ করিয়ো না—আগে হইতে সতর্ক করিয়া দিলাম।

আশীর্বাদক

শ্রীষষ্ঠীচরণ দেবশর্মণঃ

শ্রীচরণেষু,

তবে আর কী। তবে সমস্ত চুলায় যাক। বাংলাদেশ তাহার আম-কাঁঠালের বাগান এবং বাঁশঝাড়ের মধ্যে বসিয়া কেবল ঘরকন্না করিতেই থাক্‌। স্কুল উঠাইয়া দাও, সাপ্তাহিক এবং মাসিক সমুদয় কাগজপত্র বন্ধ করো, পৃথিবীর সকল বিষয় লইয়াই যে আন্দোলন-আলোচনা পড়িয়া গিয়াছে সেটা বলপূর্বক স্থগিত করো, ইংরেজি পড়া একেবারেই বন্ধ করো, বিজ্ঞান শিখিয়ো না, যে সমস্ত মহাত্মা মানবজাতির জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের ইতিহাস পড়িয়ো না, পৃথিবীর যে সকল

মহৎ অনুষ্ঠান বাসুকির ন্যায় সহস্র শিরে মানবজাতিকে বিনাশ-বিশৃঙ্খলা হইতে রক্ষা করিয়া অটল উন্নতির পথে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়া থাকো। অর্থাৎ যাহাতে করিয়া হৃদয় জাগ্রত হয়, মনে উদ্যমের সঞ্চার হয়, বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হইয়া একত্র কাজ করিবার জন্য অনিবার্য আবেগ উপস্থিত হয়—সে-সমস্ত হইতে দূরে থাকো। পড়িবার মধ্যে নূতন পঞ্জিকা পড়ো, কোন্ দিন বার্তাকু নিষেধ ও কোন্ দিন কুষ্মাণ্ড বিধি তাহা লইয়া প্রতিদিন সমালোচনা করো। দালান, ডাবাহুঁকা, নস্য ও নিন্দা লইয়া এই রৌদ্রতাপদগ্ধ নিদাঘ-মধ্যাহ্ন অতিবাহিত করো। সন্তানদের মাথার মধ্যে চাণক্যের শ্লোক প্রবেশ করাইয়া সেই মাথাগুলো ইহকাল ও পরকালের মতো ভক্ষ্য পদার্থ করিয়া রাখো।

দাদামহাশয়, তুমি কি সত্যই বলিতেছ, আমরা এক শত বৎসর পূর্বে যেরূপ ছিলাম, অবিকল সেইরূপ থাকাই ভালো, আর কিছুমাত্র উন্নতি হইয়া কাজ নাই। জ্ঞান লাভ করিয়া কাজ নাই, পাছে প্রবল জ্ঞানলালসা জন্মিয়া আমাদের দুর্বল দেহকে জীর্ণ করিয়া ফেলে। লোকহিতপ্রবর্তক উপদেশ শুনিয়া কাজ নাই পাছে মানবহিতের জন্য কঠোর ব্রত পালন করিতে গিয়া এই প্রখর রৌদ্রতাপে আমরা শুষ্ক হইয়া যাই। বড়োলোকের জীবনবৃত্তান্ত পড়িয়া কাজ নাই, পাছে এই মশকের দেশে জন্মগ্রহণ করিযাও আমাদের দুর্বল হৃদয়ে বড়োলোক হইবার দুরাশা জাগ্রত হয়। তুমি পরামর্শ দিতেছ ঠাণ্ডা হও, ছায়ায় থাকো, গৃহের দ্বার রুদ্ধ করো, ডাবের জল খাও, নাসারন্ধ্রে তৈল দাও, এবং স্ত্রীপুত্রপরিবার ও প্রতিবেশীদিগকে লইয়া নিরুপদ্রবে সুখনিদ্রার আয়োজন করো।

কিন্তু এখন পরামর্শ দেওয়া বৃথা—সাবধান করা নিষ্ফল। বাঁশির ধ্বনি কানে আসিয়াছে, আমরা গৃহের বাহির হইব। যে বন্ধনে আমরা সমস্ত মানব জাতির সহিত যুক্ত, সেই বন্ধনে আজ টান পড়িয়াছে। বৃহৎ মানব আমাদিগকে ডাকিতেছে, তাহার সেবা করিতে না পারিলে আমাদের জীবন নিষ্ফল। আমাদের পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, সৌভ্রাত্র, বাৎসল্য, দাম্পত্য প্রেম সমস্ত সে চাহিতেছে, তাহাকে যদি বঞ্চিত করি তবে আমাদের সমস্ত প্রেম ব্যর্থ হয়, আমাদের হৃদয় অপরিতৃপ্ত থাকে। যেমন বালিকা স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে যতই স্বামিপ্রেমের মর্ম অবগত হইতে থাকে, ততই তাহার হৃদয়ের সমুদয় প্রবৃত্তি স্বামীর অভিমুখিনী হইতে থাকে, তখন শরীরের কষ্ট, জীবনের ভয় বা কোনো উপদেশই তাহাকে স্বামিসেবা হইতে ফিরাইতে পারে না, তেমনি আমরা মানবপ্রেমের মর্ম অবগত হইতেছি এখন আমরা মানবসেবায় জীবন উৎসর্গ করিব, কোনো দাদামশায়ের কোনো উপদেশ তাহা হইতে আমাদিগকে নিবৃত্ত

করিতে পারিবে না। মরণ হয় তো মরিব, কোনো উপায় নাই। কী সুখেই বা বাঁচিয়া আছি।

আনন্দের কথা বলিতেছ। এই তো আনন্দ। এই নূতন জ্ঞান, এই নূতন প্রেম, এই নূতন জীবন—এই তো আনন্দ। আনন্দের লক্ষণ কি কিছু ব্যক্ত হইতেছে না, জাগরণের ভাব কি কিছু প্রকাশ পাইতেছে না। বঙ্গসমাজের গঙ্গায় একটা জোয়ার আসিতেছে বলিয়া কি মনে হইতেছে না। তাই কি সমাজের সর্বাঙ্গ আবেগে চঞ্চল হইয়া উঠে নাই। আমাদের এ-দেশ নিরানন্দের দেশ, আমাদের এ-দেশে রোগ শোক তাপ আছে, রোগে শোকে নিরানন্দে জীর্ণ হইয়া মরিতে বসিয়াছি—সেই জন্যই আমরা আনন্দ চাই, জীবন চাই—সেই জন্যই বলিতেছি নূতন স্রোত আসিয়া আমাদের মুমূর্ষু হৃদয়ের স্বাস্থ্য বিধান করুক—মরিতেই যদি হয় যেন আনন্দের প্রভাবেই মরিতে পারি।

আর, মরিব কেন। তুমি এমনি কি হিসাব জান যে, এক বারে ঠিক দিয়া রাখিয়াছ যে, আমরা মরিতেই বসিয়াছি। তোমার বুড়োমানুষের হিসাব অনুযায়ী মনুষ্যসমাজ চলে না। তুমি কি জান, মানুষ সহসা কোথা হইতে বল পায়, কোথা হইতে দৈবশক্তি লাভ করে। মনুষ্যসমাজ সাধারণত হিসাবে চলে বটে, কিন্তু এক-এক সময়ে সেখানে যেন ভেলকি লাগিয়া যায় তখন আর হিসাবে মেলে না। অন্য সময়ে দুয়ে দুয়ে চার হয় সহসা এক দিন দুয়ে দুয়ে পাঁচ হইয়া যায়, তখন বুড়োমানুষেরা চক্ষু হইতে চশমা খুলিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে। সহসা যখন নূতন ভাবের প্রবাহ উপস্থিত হইয়া জাতির হৃদয়ে আবর্ত রচনা করে তখনই সেই ভেলকি লাগিবার সময়—তখন যে কী হইতে কী হয় ঠাহব পাইবার জো নাই। অতএব আমবাগানে আমাদের সেই ক্ষুদ্র নীড়ের মধ্যে আর ফিরিব না।

হয় মরিব নয় বাঁচিব, এই কথাই ভালো। মরিবার ভয়ে বাঁচিয়া থাকিবার দরকার নাই। ক্রম্‌ওয়েল যখন প্রজাদলের দাসত্বরজ্জু ছেদন করিতেছিলেন তখন তিনি মরিতেও পারিতেন, বাঁচিতেও পারিতেন, ওয়াশিংটন যখন নূতন জাতির স্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা উঠাইয়াছিলেন তখন তিনি মরিতেও পারিতেন, বাঁচিতেও পারিতেন। পৃথিবীর সর্বত্রই এমন কেহ মরে কেহ বাঁচে—তাহাতে আপত্তি কী। নিরুদ্যমই প্রকৃত মৃত্যু। আমরা হয় বাঁচিব না হয় মরিব—তাই বলিয়া কাজকর্ম ছাড়িয়া দিয়া দাদামহাশয়ের কোলের কাছে বসিয়া সমস্ত দিন উপকথা শুনিতে পারিব না। তোমার কি ভয় হয় পাছে তোমার বংশে বাতি দিবার কেহ না থাকে। জিজ্ঞাসা করি, এখনই বা কে বাতি দিতেছে। সমস্তই যে অন্ধকার।

বিদায় লইলাম দাদামশায়। আমাদের আর চিঠিপত্র চলিবে না। আমাদের কাজ করিবার বয়স। সংসারে কাজের বাধা যথেষ্ট আছে—পদে পদে বিঘ্নবিপত্তি, তাহার পরে বুড়োমানুষদের কাছ হইতে যদি নৈরাশ্য সঞ্চয় করিতে হয় তাহা হইলে যৌবন ফুরাইবার আগেই বৃদ্ধ হইতে হইবে। তাহা হইলে পঞ্চাশে পৌছিবার পূর্বেই অরণ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে। সম্মুখে আমাকে আহ্বান করিতেছে, আমি তোমার দিকে ফিরিয়া চাহিব না। তুমি বলিতেছ পথের মধ্যে খানা আছে ডোবা আছে সেইখানে পড়িয়া তুমি ঘাড় ভাঙিয়া মরিবে, অতএব ঘরের দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া থাকাই ভালো—আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করি না। আমি দুর্বল সত্য, কিন্তু তোমার উপদেশে আমি তো বল পাইতেছি না, আমার ব্রতপালনের পক্ষে আমি হীনবুদ্ধি বটে কিন্তু তোমার উপদেশে আমি তো বুদ্ধি পাইতেছি না, অতএব আমার যেটুকু বল যেটুকু বুদ্ধি আছে তাহাই সহায় করিয়া চলিলাম, মরিতে হয় তো চিরজীবন-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া মরিব।

সেবক

শ্রীনবীনকিশোর শর্মণঃ

চিরঞ্জীবেষু

ভায়া, তোমার চিঠিতে কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ পাইতেছে। তাহাতে আমি দুঃখিত নই। তোমাদের রক্তের তেজ আছে; মাঝে মাঝে তোমরা যে গরম হইয়া উঠ, ইহা দেখিয়া আমাদের আনন্দ বোধ হয়। আমাদের মতো শীতল রক্ত যদি তোমাদের হইত তাহা হইলে পৃথিবীর কাজ চলিত কী করিয়া। তাহা হইলে ভূমণ্ডলের সর্বত্র মেরুপ্রদেশে পরিণত হইত।

অনেক বুড়ো আছে বটে, তাহারা পৃথিবী হইতে যৌবনতাপ লোপ করিতে চায়, তাহাদের নিজ হৃদয়ের শৈত্য সর্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত হয় এই তাহাদের ইচ্ছা। যেখানে একটুমাত্র তাত পাওয়া যায়, সেইখানেই তাহারা অত্যন্ত ঠাণ্ডা ফুঁ দিয়া সমস্ত জুড়াইয়া হিম করিয়া দিতে চাহে। অর্থাৎ পৃথিবী হইতে কাঁচা চুল আগাগোড়া উৎপাটন করিয়া তাহার পরিবর্তে তাহারা পাকা চুল বুনানি করিতে চায়; তাহারা যে এক কালে যুবা ছিল তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া যায়, এই জন্য যৌবন তাহাদের নিকটে একেবারে দুর্বোধ হইয়া পড়ে। যৌবনের গান শুনিয়া তাহারা কানে আঙুল দেয়, যৌবনের

কাজ দেখিয়া তাহারা মনে করে পৃথিবীতে কলিযুগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। শ্যামল কিশলয়ের অসম্পূর্ণতা দেখিয়া ধূলিশায়ী জীর্ণ পত্র যেমন অত্যন্ত শুষ্ক পীত হাস্য হাসিতে থাকে, অপরিণত যৌবনের সরস শ্যামলতা দেখিয়া অনেক বৃদ্ধ তেমনি করিয়া হাসিয়া থাকে। এই জন্যই ছেলে-বুড়োর মাঝখানে এত দৃঢ় ব্যবধান পড়িয়া গিয়াছে।

আমার কি ভাই সাধ যে, কেবল কতকগুলো উপদেশের ধোঁয়া দিয়া তোমাদের কাঁচা মাথা একদিনে পাকাইয়া তুলি। কাজ করিতে যদি পারিতাম তা হইলে কি আর সমালোচনা করিতে বসিতাম। তোমরা যুবা, তোমাদের কত সুখ আছে বলো দেখি; আমাদের উদ্যমের সুখ নাই, কর্মানুষ্ঠানের সুখ নাই, একমাত্র বকুনির সুখ আছে তাহাও সম্মুখের দন্তাভাবে ভালোরূপে সমাধা হয় না, ইহাতেও তোমরা চটিলে চলিবে কেন।

কাজ নাই ভাই, আমার সংশয় আমার বিজ্ঞতা আমার কাছেই থাক্‌, তোমরা নিঃসংশয়ে কাজ করো, নির্ভয়ে অগ্রসর হও। নূতন নূতন জ্ঞানের অনুসন্ধান করো, সত্যের জন্য সংগ্রাম করো, জগতের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করো। যে স্রোতে পড়িয়াছ, এই স্রোতকেই অবলম্বন করিয়া উন্নতি-তীর্থের দিকে ধাবমান হও, নিমগ্ন হইলে লজ্জার কারণ নাই, উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তোমাদের জন্মলাভ সার্থক হইবে, তোমাদের দুঃখিনী জন্মভূমি ধন্য হইবে।

আমি যে চিরজীবন কাটাইয়া অবশেষে যাবার মুখে তোমাদের দুটো-একটা কথা বলিয়া যাইতেছি, তাহা শুনিলে যে তোমাদের উপকার হইবে না, এ-কথা আমার বিশ্বাস হয় না। তাহার সকল কথাই যে বেদবাক্য তাহা নহে, কিংবা তাহার সকল কথাই যে এখনকার দিনে খাটিবে তাহাও নহে, কিন্তু ইহা নিঃসংশয় যে, তাহাতে কিছু না কিছু সত্য আছেই, আমার এই সুদীর্ঘ জীবন কিছু সমস্ত ব্যর্থ, সমস্ত মিথ্যা নহে; এই সংশয়াচ্ছন্ন সংসারে আমার দীর্ঘ জীবন যে, সত্য পথ নির্দেশের কিছুমাত্র সহায়তা করিবে না তাহা আমার মন বলিতে চায় না। এই জন্য, আমি কোনো দৃঢ় অনুশাসন প্রচার করিতে চাই না, আমি বলিতে চাই না আমার সমস্ত কথা আগাগোড়া পালন না করিলে তোমরা উৎসন্ন যাইবে, আমি কেবল এই বলিতে চাই আমার কথা মনোযোগ দিয়া শুন, একেবারে কানে আঙুল দিয়ো না, তার পরে বিচার করো, বিবেচনা করো, যাহা ভালো বোধ হয় তাহা গ্রহণ করো। সম্মুখের দিকে অগ্রসর হও কিন্তু পশ্চাতের সহিত বিবাদ করিয়ো না। এক প্রেমের সূত্রে অতীত-বর্তমান ভবিষ্যৎকে বাঁধিয়া রাখো।

আমার তো ভাই যাবার সময় হইয়াছে। "যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনামা-

বিকৃতারুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।” আমরা সেই অস্তগামী চন্দ্র, আমরা রজনীতে রঙ্গভূমির নিদ্রিতাবস্থায় বিরাজ করিতেছিলাম; তখন যে একটি সুগভীর শান্তি ও সুস্নিগ্ধ মাধুর্য ছিল তাহা অস্বীকার করিবার কথা নহে, কিন্তু তাই বলিয়া আজ এই যে কর্মকোলাহল জাগাইয়া অরুণোদয় হইতেছে, ইহাকে সাদর সম্ভাষণ না করিব কেন। কেন বলিব তীক্ষ্ণপ্রভ দিবসের প্রয়োজন নাই, রজনীর পরে রজনী ফিরিয়া আসুক। এস অরুণ, এস, তুমি আকাশ অধিকার করো, আমি নীরবে তোমাকে পথ ছাড়িয়া দিই। আমি তোমার দিকে চাহিয়া ক্ষীণহাস্তে তোমাকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় গ্রহণ করি। আমার নিদ্রা, আমার শান্ত নীরবতা, আমার স্নিগ্ধ হিমসিক্ত রজনী আমার সঙ্গে সঙ্গেই অবসান হইয়া যাক, তোমারই সমুজ্জ্বল মহিমা জীবন বিতরণ করিয়া জলে স্থলে চরাচরে ব্যাপ্ত হইতে থাকুক।

আশীর্বাদক

শ্রীষষ্ঠীচরণ দেবশর্মণঃ